

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

বিচিত্র-জীবন গ্রন্থমালা ঃ



ছোটদের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

সরলানন্দ সেন

॥ প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৮ ॥

॥ দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৬২ ॥

দাম ঃ এক টাকা চারি আনা

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীগৌরহরি মাইতি কর্তৃক ৯এ মনমোহন বসু স্ট্রীট কলিকাতা-৬ বাণী-মুদ্রণ হইতে মুদ্রিত।

॥ এক ॥

"বড় হলে তোমরা কি করবে ?"

গুরুজনের এইরূপ এক প্রশ্নের উত্তরে একটি বালক উত্তর দিয়াছিল ঃ "উকিলরা সব জোচ্চোর হয়, আমি কিছুতেই উকিল হব না।"

বালকের এই স্পষ্ট ও নির্ভীক উক্তির মধ্যেই তাঁহার ভবিষ্যৎ সূচিত হয়।

বালকটির নাম চিত্তরঞ্জন, আর প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহারই জ্যেঠামশায় দুর্গামোহন।

ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত তেলিরবাগ গ্রামে সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশে চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তেলিরবাগ এখন পদ্মাগর্ভে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। দানশীল বলিয়া এই বৈদ্যপরিবারের প্রচুর খ্যাতি ছিল। রতনকৃষ্ণ দাশ নামে এই বংশে একজন অতিথিবৎসল হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদ্বন্ধু একজন খ্যাতিমান মোক্তার ছিলেন। জগদ্বন্ধুর খুল্লতাত ভ্রাতা কাশীশ্বরের তিন পুত্র ঃ কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন। জগদ্বন্ধুর পুত্র-সন্তান না থাকায় তিনি ভুবনমোহনকে দত্তক-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই দাশবংশের প্রায় সকলেই আইনজীবী ছিলেন। কাশীশ্বর ও জগদ্বন্ধু উভয়েই সরকারী উকিল ছিলেন। কালীমোহন, দুর্গামোহন ও ভুবনমোহন তিন ভাই-ই হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতেন। দুর্গামোহনের তিন পুত্র ব্যারিস্টার

ছিলেন। ভুবনমোহনের তিন পুত্র চিত্তরঞ্জন, প্রফুল্লরঞ্জন, ও বসন্তরঞ্জনও ব্যারিস্টার ছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের স্পষ্টোক্তিতে তাঁহার জ্যেঠামশায় যারপরনাই বিরক্ত হন। দুর্গামোহন বলিলেন, "তাহ'লে কি তোমার বড় জ্যেঠামশাই, আমি ও তোমার বাবা সব জোচ্চোর ?" চিত্তরঞ্জন এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "তোমরা কি কর, জানি না, কিন্তু উকিলের ব্যবসায়ে জোচ্চুরি না করলে উন্নতি নেই।"

অথচ অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে সেই আইনজীবীর বৃত্তিই গ্রহণ করিতে হয়।

চিত্তরঞ্জনের পিতামহ কাশীশ্বর নিজের অর্জিত সমস্ত অর্থ গ্রামের অতিথিশালার জন্য ব্যয় করিতেন। তাঁহার অতিথিশালায় যথোচিতরূপে অতিথি-পরিচর্যা হইতেছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একবার তিনি গভীর রাত্রিতে ছদ্মবেশে নৌকা করিয়া গ্রামের ঘাটে যান এবং অতিথিশালায় অতিথির আগমনবার্তা প্রেরণ করেন। কিন্তু এত রাত্রিতে অতিথিশালা হইতে কেহ আসিল না, কোন সাড়াও দিল না।

তখনই তিনি আত্মপরিচয় দিলেন না।

পর দিবস অতিথিশালার কর্মচারীকে ডাকাইয়া তিনি ভবিষ্যতের জন্য তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেন।

পুত্র ভুবনমোহন পিতার নিকট হইতে দানশীলতার স্বভাব প্রাপ্ত হন এবং দান করিতে করিতে তিনি শেষ জীবনে দেউলিয়া হন। তেমনি চিত্তরঞ্জনও সর্বস্ব পরার্থে উৎসর্গ করিয়া শেষ জীবনে নিঃস্ব হইয়া পড়েন।

বাংলা ১২৭৭ সালের ২০শে কার্তিক (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর) শনিবার, কলিকাতা পটুয়াটোলা লেনে চিত্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁহাকে ভবানীপুরস্থ 'লণ্ডন মিশনারী স্কুল'-এ ভর্তি করিয়া দেওয়া হয়। এই স্কুল হইতেই তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ছাত্রজীবনে চিত্তরঞ্জন কিছু অসাধারণ মেধাবী ছিলেন না; কিন্তু বাল্যকাল হইতেই দল বাঁধিতে অভ্যস্ত ছিলেন। দলের প্রত্যেককে তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন এবং নিজের জলখাবার পয়সা হইতে তিনি বন্ধুদিগকে সাদরে খাওয়াইতেন।

তিনি বাল্যকাল হইতেই কবিতা লিখিতে অভ্যস্ত ছিলেন। কবি রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়" এবং হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতা দুইটি তাঁহার খুব প্রিয় ছিল এবং তিনি সোৎসাহে উহা আবৃত্তি করিতেন।

ক্লাসের পড়াশুনায় তাঁহার বিশেষ মন ছিল না। একদিকে শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ্য বই পড়াইতেন, অন্যদিকে তিনি একনিবিষ্ট চিত্তে বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়িতেন, নয়ত আপন মনে কবিতা লিখিতে থাকিতেন। এই সময়ে বঙ্কিমের রচনা তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। 'বঙ্গদর্শন' পাঠে তাঁহার উৎসাহের অবধি ছিল না। 'কমলাকান্ত,' 'আনন্দমঠ,' 'লোকরহস্য' ও 'অনুশীলন' তাঁহার প্রিয়-পাঠ্য ছিল। তিনি বঙ্কিমকে হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসন দেন। পাঠ্য নয়, এমন অনেক বই তিনি নিজের পয়সায় কিনিতেন ও সারা বৎসর সেইগুলি গভীর আগ্রহ লইয়া পাঠ করিতেন। তারপর বার্ষিক পরীক্ষা নিকটবর্তী হইলে রাত্রি জাগিয়া ক্লাসের পড়ায় মন দিতেন। এই ভাবেই তিনি বি. এ. পরীক্ষায় পাস করেন।

বাগ্মিতা ও তর্কশক্তিতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ও ধীশক্তির পরিচয় ছাত্রজীবনেই পাওয়া যায়। যুক্তিপ্রদর্শন ও তর্কের ক্ষমতায় তাঁহার প্রতিপক্ষকেও তিনি মুগ্ধ করিতেন। সহপাঠী এবং সমবয়স্কদের প্রতি তাঁহার প্রীতি ও দরদ ছিল তুলনাহীন। কাহারও উপর অন্যায় হইতেছে দেখিলে তিনি উত্যক্ত হইয়া উঠিতেন এবং তারস্বরে তাহার প্রতিবাদ করিতেন।

॥ দুই ॥

১৮৯০ সালে বি. এ. পাস করিয়া তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় প্রতিযোগিতার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৯১-৯২ সালে তিনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেন। প্রায় এক মাস পরীক্ষা হয়। কিন্তু চিত্তরঞ্জন সব পরীক্ষা দেন নাই। তাঁহার ধারণা ছিল, তাঁহার পরীক্ষা ভাল হইতেছিল না। শেষে তাঁহার অনুমানই সত্য হইয়াছিল। পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হন। অবশ্য অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। কিন্তু, পরীক্ষায় কৃতকার্যদের মধ্যে একজন ডাক্তারের নিকট হইতে সন্তোষজনক সার্টিফিকেট পান না এবং আর একজন চাকুরি পাইয়াও তাহা গ্রহণ করেন না। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে অতঃপর তাঁহারই চাকুরি পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হন।

অনেকের ধারণা, রাজনৈতিক মতামতের জন্যই তাঁহাকে এই-ভাবে বঞ্চিত করা হয়।

বস্তুতঃ লণ্ডনে রাজনীতি বিষয়ে প্রায়শঃ তিনি নীরবই থাকিতেন;

কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার অবমাননাকর উক্তি সহ্য করা তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল। জাতীয়তাবোধ যে তাঁহার কত তীব্র ও গভীর ছিল, তাহার প্রথম পরিচয় এখানে এক ঘটনায় পাওয়া যায়।

পার্লামেণ্টের জনৈক সদস্য মিঃ জেম্‌স ম্যাক্‌লিন একদিন বলিলেন, "ভারতে আবার সভ্যতা কোথায়? হিন্দু-মুসলমান ত গোলামের জাত ছাড়া কিছুই নয়!" এই উক্তি চিত্তরঞ্জনের মনে তপ্ত কটাহে তৈলরাশির মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ আরম্ভ করিলে মিঃ ম্যাক্‌লিন ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ব্যারিস্টারি পাস করিয়া ১৮৯৪ সালে তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইংরেজী সভ্যতার প্রভাবে পড়িয়াও চিত্তরঞ্জন কোনদিনই বাঙ্গালীত্ব হারান নাই। সাজপোশাক, আদবকায়দা এবং ইংরেজীতে বক্তৃতা-শক্তি সবই ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার অনুবর্তী হইলেও তাঁহার মন ছিল খাঁটি বাঙ্গালীর।

বিলাত হইতে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি সর্বাগ্রে মায়ের পদধূলি গ্রহণ করিলেন। মায়ের প্রতি তিনি চিরদিন অনুরক্ত ছিলেন। বালক বয়সে টক্ জিনিস চিত্তরঞ্জনের খুব প্রিয় ছিল। টক্ না হইলে খাওয়ায় তাঁহার রুচি আসিত না। মা বলিতেন, "এই অভ্যাস তোমাকে ছাড়তে হবে। একটা বস্তুবিশেষের প্রতি আসক্তি থাকতে নেই।"

মায়ের শাসনে তাঁহাকে সেই অভ্যাস ছাড়িতে হয়। তাঁহার পরবর্তী জীবনেও দেখা যায়, মায়ের শাসন অদ্ভুত কার্যকর

হইয়াছিল। দীর্ঘদিনের অভ্যাস মদ্যপান ও তামাকু-সেবন তিনি উত্তরকালে একই মনোবলে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করেন।

চিত্তরঞ্জন বলিতেন, "দেখো, যে নিজের মাকেও ভালরকমে চিনে না, সে দেশমাতার সেবা করার অধিকারী নয়।"

মায়ের আকাঙ্ক্ষা-পূরণ তাঁহার জীবনের অনন্যব্রত ছিল। মা খুব ভাল আমসত্ত্ব তৈয়ার করিতে পারিতেন বলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে আমসত্ত্বের জন্য তিনি মাকে হাজার টাকা দিয়া রাখিতেন।

ব্যারিস্টারিতে চিত্তরঞ্জনের পসার জমিবার পূর্বেই পিতৃঋণ-শোধের চিন্তায় তাঁহাকে বিব্রত হইয়া পড়িতে হয়। পিতা ভুবনমোহন দান করিতে করিতে দরিদ্র হইয়া পড়েন। কিন্তু ঋণগ্রস্ত হইয়াও তিনি আশ্রিত জনের প্রতি কদাপি হৃদয়হীন ব্যবহার করিতে পারিতেন না।

তিনি আত্মীয়স্বজন-পরিবৃত হইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অনেক ছেলে পড়াশুনা করিত। ইহারা সকলেই ছিল অনাত্মীয়। চিত্তরঞ্জন বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন ব্যারিস্টারি আরম্ভ করিলেন, তখনও তাঁহাদের বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন কম ছিল না। তিনি পিতাকে পরামর্শ দিলেন, দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়দিগকে অন্যত্র রাখিয়া ভাতা দিলে কেমন হয়। তাঁহার পিতা উহাতে সম্মত হন নাই।

পিতার ঋণ পরিশোধ কেমন করিয়া করা যায়, সেই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু, ব্যাকুল হইলেও তিনি ভগ্নোৎসাহ হওয়ার পাত্র ছিলেন না। তিনি কঠোর অধ্যবসায়, শ্রম-স্বীকার ও সততা সহকারে পিতৃঋণ শোধ করিয়া স্বীয় জীবনে

প্রতিষ্ঠা-অর্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। ভবিষ্যতে তিনি কড়ায় গণ্ডায় ঋণ শোধ করিবেন, মনে মনে এরূপ সঙ্কল্প পোষণ করিলেও নিজেকে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করিতে হইল।

১৮৯৭ সালে তেলিরবাগের সংলগ্ন নওগাঁও গ্রামের হালদার-পরিবারের বরদা হালদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা বাসন্তী দেবীর সহিত চিত্তরঞ্জনের বিবাহ হয়। বাসন্তী দেবী ব্রাহ্মণ-কন্যা ছিলেন।

॥ তিন ॥

পূর্বেই বলিয়াছি, চিত্তরঞ্জনের পরিবারে প্রায় সকলেই ছিলেন আইনজ্ঞ। কেউ উকিল, কেউ ব্যারিস্টার, কেউ ল-মেম্বর, কেউ জজ, কেউ সাব-জজ। চিত্তরঞ্জন আইন-ব্যবসায়কে যে সর্বান্তঃকরণে অপছন্দ করিতেন, তাহাও আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু আই. সি. এস্ পরীক্ষায় ব্যর্থ হইয়া তিনি ব্যারিস্টারি পাস করিলেন। এখন ঋণগ্রস্ত ও দারিদ্র্যদশাপন্ন পিতার সকল দুঃখ-দৈন্যের পাষাণভার তাঁহারই স্কন্ধে আসিয়া পড়িল। তাঁহাকে ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, আইন-ব্যবসায় করিতেই হইবে। বৃদ্ধ পিতার ভরসাস্থল জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্তরঞ্জন তাই সকল দুর্যোগ ও দুর্দৈবের মধ্যে হিমাচলের ন্যায় অটল ও অবিচলিত থাকিয়া স্বীয় ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করিলেন।

ভাবীকালে এই ব্যবসায়ে প্রভূত ধন ও অতুল যশের অধিকারী হইয়াও চিত্তরঞ্জন তাঁহার এক আত্মীয়ের কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "It is the greatest tragedy in my life

that I have been drawn to a profession that I do not like."

"যে কাজে আমি আনন্দ পাই না, উহাতেই আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইল, ইহা আমার পক্ষে বড়ই দুঃখজনক ঘটনা।"

দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করিয়াই অকুতোভয় চিত্তরঞ্জন স্বীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পিতা অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। এখন পরিবারের পরিচালনাভার সম্পূর্ণ তাঁহার উপর। ইহার ফলে এমন এক সঙ্কটকাল আসিয়াছে যে, দৈনন্দিন বাজার-খরচের পয়সাও হাতে থাকে না, অপরের কাছ হইতে ধার করিয়া দিন চালাইতে হইয়াছে। পকেটে ট্রামের ভাড়া নাই, পায়ে হাঁটিয়া কোর্ট হইতে বাড়ী ফিরিতে হইয়াছে।

স্ত্রী বাসন্তী দেবীর এমন দিনও গিয়াছে, হাতে তাঁহার একটি টাকা অবশিষ্ট আছে, তা-ই দিয়া খরচ নির্বাহ করিতে হইবে। সারাদিন তিনি পথ-পানে তাকাইয়া আছেন। স্বামী কোর্ট হইতে ফেরামাত্র সকলের আগে প্রশ্ন করিয়াছেন, "কিছু পেয়েছ ?"

চিত্তরঞ্জন হয়ত মাথা নাড়িয়া উত্তর দিয়াছেন, "না।"

ঘরে বৃদ্ধ শ্বশুর, রাত্রে তাঁহার জলযোগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার এই টাকাটি হইতেই পরের দিন বাজার সারিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া কোর্টে পাঠাইতে হইবে। চিত্তরঞ্জনের যোগ্যা জীবন-সঙ্গিনী বাসন্তী দেবীও এত দুঃখের আঘাতে কখনও মুষড়িয়া পড়েন নাই। স্বামীর সুখ-দুঃখ অম্লানবদনে সমান ভাগ করিয়া লইয়াছেন।

কখনও এমন হইয়াছে যে, চিত্তরঞ্জনের হাতে একটি পয়সাও নাই, সারাদিন কোর্টে পয়সা পাওয়া যায় নাই। বাড়ী আসার সময় তিনি বার-লাইব্রেরির পরিচারকের নিকট হইতে চুরুট কেনার নাম করিয়া গোটা কতক টাকা ধার করিয়া আনিলেন এবং বাড়ী পৌঁছিয়া বাসন্তী দেবীর হাতে সেই টাকা দিলেন।

আইন-ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া চিত্তরঞ্জন প্রথমে হাইকোর্টের সদর দেওয়ানী বিভাগে কাজ করিতে পারিতেন না। তাঁহার নগদ পয়সা প্রয়োজন। হাইকোর্টে দেওয়ানী বিভাগে না ঢুকিয়া তিনি তাই শহর ছাড়িয়া মফঃস্বলের আদালতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। সেখানে এক কি দেড় সপ্তাহ কাল থাকিয়া যে টাকা রোজগার করিতেন, তা-ই দিয়া সংসারখরচ নির্বাহ হইত।

আইন ব্যবসায়ের প্রারম্ভে চিত্তরঞ্জনের বড় সহায় ছিলেন তাঁহার তৃতীয়া ভগ্নী প্রমীলা দেবীর স্বামী শরৎচন্দ্র সেন। তিনি ছিলেন চিত্তরঞ্জনের বাল্যবন্ধু ও যৌবনের সহচর। জীবনের শেষ দিনটি অবধি তাঁহাদের সৌহার্দ্য অটুট ছিল।

আলিপুরে চিত্তরঞ্জনের উপার্জন-বৃদ্ধির সূচনায় যে মোকদ্দমাটির সাফল্য, এখানে তাহা বলিব ঃ কালীঘাট হইতে প্রকাশিত 'Power and Guardian' নামক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আলিপুরের মোক্তার কালীপদ বন্দোপাধ্যায়কে প্রহার করিয়াছিলেন। যে পুলিস-ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই মামলার বিচার হয়, সেই আদালতে আসামী-পক্ষের উকিল আশুতোষ বিশ্বাসের সহিত তাঁহার ব্যক্তিগত বন্ধুতা ছিল। তাই ফরিয়াদী-পক্ষের উকিল কালীপদ বাবুর ব্যারিস্টারকে গ্রাহ্য করিতেন না। আলিপুরের

মোক্তাররা এই অবস্থায় চিত্তরঞ্জনের ভগ্নীপতি শরৎ সেনের মাধ্যমে তাঁহার সাহায্যার্থী হন।

চিত্তরঞ্জন কোনপ্রকার ফি না লইয়া মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। প্রতিপক্ষের উকিল আশুবাবু চিত্তরঞ্জনের সম্মুখে আত্মসংবরণ করিয়া চলিতে বাধ্য হইলেন। যুবক চিত্তরঞ্জন নির্ভীককণ্ঠে হাকিমকে বলিলেন, "আপনার পক্ষপাতিত্বের দরুন কোন কৌন্সিল আপনার আদালতে আসিতে চাহেন না।"

এই মামলায় আসামী খালাস পাইলেও, চিত্তরঞ্জনের স্পষ্ট-বাদিতার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। ক্রমে তাঁহার উপার্জনও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ইহার পর চিত্তরঞ্জন কয়েকটি স্বদেশী মামলায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। প্রথমে 'বন্দে মাতরম্' মামলার কথা বলিব।

১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে এই ইংরেজী দৈনিক পত্রটি প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদকীয় লিখিতেন অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল। "ভারত ভারতীয়দের জন্য"—ইহাই ছিল এই দৈনিকের মূলমন্ত্র।

সেই যুগে এই মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া কাগজ পরিচালনা করা বা প্রবন্ধ লেখা সহজ কথা ছিল না। ১৯০৭ সালের ২৭শে জুন ও ২৮শে জুলাই তারিখে এই কাগজে প্রকাশিত দুইটি প্রবন্ধের জন্য ২৬শে অগস্ট তারিখে প্রধান সম্পাদকরূপে অরবিন্দ ঘোষকে, ম্যানেজাররূপে হেমেন্দ্রনাথ বাগচীকে এবং মুদ্রাকররূপে অপূর্বকৃষ্ণ বসুকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ক ধারানুযায়ী রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়।

চিত্তরঞ্জনের আশঙ্কা হইল, এই মামলায় বিপিনবাবু সাক্ষী হইলে অরবিন্দবাবুর প্রতি জেলের আদেশ অনিবার্য এবং অরবিন্দবাবুর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ হইলে 'বন্দে মাতরম্' বন্ধ হইয়া যাইবে।

তিনি বিপিনবাবুকে সাক্ষ্যদান হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং এই অপরাধে বিপিনবাবুর জেল হইলে চিত্তরঞ্জন উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বিপিনবাবু ইহাতে রাজী হইলেন।

মোকদ্দমার তারিখে পুলিস-কোর্টে সোৎসুক জনতার অভূতপূর্ব ভীড় হয়। পুলিস বেত মারিয়া জনতা সরাইতে উদ্যত হইলে সুশীল সেন নামে এক যুবক পুলিস-ইনস্পেক্টরকে আক্রমণ করেন। এই অপরাধে সুশীলবাবুর প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট পনেরটি বেত্রাঘাতের আদেশ দেন।

সাক্ষীর মঞ্চে দাঁড়াইয়া বিপিনবাবু সাক্ষ্যপ্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, "এই মামলা সম্পর্কে কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নই।"

বিপিনবাবুর কঠোর দণ্ড একরূপ নিঃসংশয়িত ছিল। কিন্তু আদালতে চিত্তরঞ্জনের আবেগপূর্ণ ভাষণ শুনিয়া জনতা মুগ্ধ হইয়া গেল, এমন কি হাকিমও চোখের জল ফেলিতে বাধ্য হইলেন। বিপিনবাবুর ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইল।

অতঃপর 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মামলা-পরিচালনায়ও চিত্তরঞ্জন যথেষ্ট কৃতিত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন।

বাংলাদেশের যুব-সমাজ এই সময় সাম্রাজ্যবাদীর শৃঙ্খলবন্ধন-

মোচনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া উঠে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তরুণমনে প্রগাঢ় বিদ্বেষ সঞ্চারিত হয়। পরাধীনতার জ্বালা তাঁহাদের মর্মে মর্মে। ভারত হইতে ব্রিটিশ-শাসনের মূলোচ্ছেদ এবং অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর উৎসাদনের জন্য বাংলা ও ভারতের অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের তরুণ-সম্প্রদায় সংঘবদ্ধ হয়।

আলিপুর বোমা-ষড়যন্ত্র মামলায় ইতিহাসের সেই পৃষ্ঠাই উদ্ঘাটিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আর সকল কাজ বিসর্জন দিয়া এই মামলা-পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

১৯০৮ সালের ১লা মে। এই দিন মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর নিক্ষিপ্ত বোমায় দুইজন শ্বেতাঙ্গিনী নিহত হন। তাঁহাদের লক্ষ্যস্থল ছিল অত্যাচারী মিঃ কিংসফোর্ড। কিংসফোর্ড সেই সময়ে মজঃফরপুরে জেলা-জজ ছিলেন। ইনি মানিকতলায় ধৃত আসামীদের কাহারও উপর বেত্রাঘাতের আদেশ দেন।

১লা মে তারিখেই ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী ধরা পড়েন। ২রা মে কলিকাতাস্থ মুরারিপুকুর বাগানে তল্লাসী হয় এবং বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, উপেন বাঁড়ুয্যে, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল প্রমুখ ২৬ জন বোমা-বারুদ সহ ধরা পড়েন।

তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, ১৯০৫ সালে বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাবে ইহারা বিক্ষুব্ধ হইয়া সরকারকে সশস্ত্র অভ্যুত্থান দ্বারা উচ্ছেদ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন।

আসামীদিগকে দায়রায় সোপর্দ করা হইলে আলিপুরের অতিরিক্ত জজের আদালতে তাঁহাদের বিচার আরম্ভ হয়।

সরকার-পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন কৌন্সিল মিঃ নর্টন। অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, কুমুদ চৌধুরী প্রভৃতি। অন্যান্য আসামীর পক্ষ সমর্থন করেন পি. মিত্র, জে. এন. রায় প্রভৃতি আট-নয় জন কৌন্সিল। কিন্তু অর্থাভাবহেতু অরবিন্দ-বাবুর পক্ষে মামলা-পরিচালনা কঠিন হইয়া পড়ে, তাঁহার সমর্থক কৌন্সিলগণ একে একে সরিয়া পড়েন।

অরবিন্দের এই সঙ্কটসময়ে চিত্তরঞ্জন আগাইয়া আসিলেন। এই সময়ে চিত্তরঞ্জন মাসে কমপক্ষে চারি-পাঁচ হাজার টাকা উপার্জন করিতেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত উপার্জনের লোভ বা ঋণ-পরিশোধের তাড়নাকে তিনি গ্রাহ্য করিলেন না। দিবারাত্র তিনি এই মোকদ্দমার কাজে তপশ্চর্যার নিষ্ঠা লইয়া আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার তন্ময় সাধনা নিষ্ফল হইল না। বিচারে অরবিন্দ মুক্ত হইলেন। দেশবন্ধুর নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা দেখিয়া অরবিন্দ নাকি মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমার পরিত্রাণে স্বয়ং নারায়ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

তারপর ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা, ডুমরাওন মোকদ্দমা, লছমীপুর মামলা, কোচবিহারের রাজপরিবারের গয়না চুরির মামলা, অমৃতবাজার পত্রিকা মামলা প্রভৃতিতে চিত্তরঞ্জন যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন, সেই যুগে তাহা ছিল অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

ইহার মধ্যে লছমীপুর মামলাটি ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই মামলা-পরিচালনাকালে চিত্তরঞ্জনের দৈনিক ফি ধার্য হয় এক হাজার কুড়ি টাকা।

১৯১৫ সালের জুলাই মাসে জামালপুর শহরে প্রথম জজের

আদালতে এই মামলা আরম্ভ হয়। এক বৎসর ধরিয়া এই মামলা চলে। মামলা-পরিচালনার জন্য চিত্তরঞ্জনকে ভাগলপুরে কিছুদিন সপরিবারে থাকিতে হয়।

এই মোকদ্দমার বাদীপক্ষ সমগ্র লছমীপুর এস্টেট দাবি করেন। মোকদ্দমা মীমাংসার জন্য চল্লিশটি ইস্যু ধার্য হয়।

ভাগলপুরের বাঙ্গালী অধিবাসীরা এই মামলার নাম দিয়াছিলেন, দাদা-নাতির মামলা,—তথা শিয়াল আর সিংহের মামলা। শিয়াল-দাদু হইতেছেন সি. আর. দাশ, আর সিংহ-নাতির নাম স্যার এস. পি. সিংহ। কে না জানে যে, সিংহের মামা ভোম্বল দাশ? ভোম্বল দাশ হইতেছেন সি. আর. দাশের ছেলে। কাজেই সি. আর. দাশ হইলেন এস. পি. সিংহের দাদু।

মামলায় বাদী পক্ষে ছিলেন এস. পি. সিংহ; প্রতিবাদিনী রানী কুসুমকুমারীর পক্ষে সি. আর. দাশ। মোকদ্দমার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল বাদী এবং প্রতিবাদিনীরা হিন্দু-আইন অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিতে পারেন কিনা। বাদীদের বক্তব্য হইতেছে এই যে, যদিও জমিদার-পরিবার সূর্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচিত, কিন্তু আসলে তাঁহারা আদিবাসী এবং অহিন্দু। হিন্দুরা আইনতঃ দত্তক গ্রহণ করিতে পারিলেও, এই পরিবারের অতীত ইতিহাসে এমন কোন নজির নাই। কাজেই, প্রতিবাদিনী রানী কুসুমকুমারী কর্তৃক গৃহীত দত্তক-পুত্র আইনতঃ এই এস্টেটের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন না।

এই মামলায় চিত্তরঞ্জনের অসাধারণ বাগ্মিতা ও আইন-জ্ঞান সুপ্রমাণিত হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁহারই জয় হয়।

॥ চার ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য চিত্তরঞ্জনের প্রাণে স্বদেশপ্রেমের বন্যা আনিয়াছিল। বাংলার দুঃখে তাঁহার হৃদয় বেদনাক্রান্ত হইত, নয়ন অশ্রুসজল হইত। তিনি বলিতেন ঃ

> "আমার বাংলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি। যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা-অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাংলার যে মূর্তি তাহা প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছে এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনী মূর্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমি আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্বচনীয় গর্ব অনুভব করি। বাঙ্গালীর নিজের একটা সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, কর্ম আছে, ধর্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে। বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাংলাকে জানে না।"

কখন তিনি বলিতেন,

> "বাংলার কথা কি আমরা ভাবি? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের যোগ নাই; তাই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, মাহিষ্য, পোদ, মুচি, মেথর সমস্তকে লইয়া দেশ, একা শিক্ষিতের দেশ নয়। একা আন্দোলনকারীর এতে অধিকার নাই।"

নিঃস্বের জন্য তাঁহার প্রাণের নীরব ক্রন্দন তাঁহার রচনায় প্রকাশমান ঃ

"ভ্রাতার ক্রন্দন শুনি যেয়ো নাকো ফিরিয়া
ধরণীর দুঃখ দৈন্য আছে যাহা থাক্;
উর্ধ্ব মুখে পূজা কর দেবতা গড়িয়া,
প্রাণ-পুষ্প অযতনে শুকাইয়া যাক্।"

[মালঞ্চ]

১৯০৬ সালে রাখিবন্ধন উপলক্ষে দার্জিলিংয়ে চিত্তরঞ্জন যে ভাষণ দেন, তাহাতে তাঁহার জীবনে বঙ্কিম-সাহিত্য কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য মিলে। তিনি বলিয়াছেন:

"আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তন্মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা মূলতঃ বাঙ্গালী জাতির স্বাবলম্বনের পথে প্রথম পদক্ষেপ। এক জাতিকে অন্য জাতি যে হাতে ধরিয়া তুলিতে পারে না, পৃথিবীর ইতিহাসে বারে বারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আজ আমরা বাস্তবিকই বুঝিতে পারিয়াছি যে, বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তরে বর্ণিত শীর্ণকায় কুকুরের মত শুধু করুণ নেত্রে ও প্রার্থনা-পূর্ণ দৃষ্টিতে ইংরেজের মুখের পানে শত সহস্র বৎসর ধরিয়া চাহিয়া থাকিলেও ইংরাজ তাহার পাতের মাছের কাঁটা উত্তমরূপে চুষিয়া আমাদের মুখের কাছে ফেলিয়া দিতে পারে, কিন্তু যাহাতে আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, যাহাতে আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট হয়, এমন কিছু দিবে না। আজ বিধাতা আমাদিগকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, আপনার চরণে ভর করিয়া আপনি দাঁড়াইতে না পারিলে কোন দিন আমাদের মুক্তির দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইবে না। সেই জন্যই বলিয়াছি, এই নব আন্দোলন আমাদের কাছে বাঞ্ছনীয়। ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের পথে প্রথম পদক্ষেপ।"

চিত্তরঞ্জন রাজনৈতিক ভিক্ষায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ইংরেজ

কোন দিন কৃপা করিয়া ভারতকে স্বরাজ ফল দান করিবে, ইহা ভাবিতেও তাঁহার সমগ্র মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। তাই দেখি, ১৯০৬ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতিপদ লইয়া মডারেট দলের সহিত বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জনের প্রবল মতভেদ হয়। চিত্তরঞ্জন লোকমান্য তিলককে সভাপতি-পদে চাহিতেছিলেন।

চিত্তরঞ্জনের দলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবার জন্য সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও ভূপেনবাবুর দল বৃদ্ধ নৌরজিকে সভাপতি করিতে বিলাতে তার করিয়া তাঁহার সম্মতি আদায় করেন।

চিত্তরঞ্জন বুঝিলেন, নিজেদের দলের মুখপত্র না থাকিলে রাজনৈতিক প্রচার সহজ হইতে পারে না। তাঁহার ও সুবোধ মল্লিকের চেষ্টায় এই সময় প্রথম ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশিত হয়। "ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ" ছিল ইহার মূলমন্ত্র। চিত্তরঞ্জন ১৯০৬ সালের কংগ্রেস একরূপ বয়কট করেন বলা চলে। সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের পরে ১৯০৬ সাল হইতে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত চিত্তরঞ্জন নরমপন্থীদের সহিত কোন সম্পর্ক রাখেন নাই।

১৯১৭ সালের ১৬ই জুলাই প্রখ্যাতা দেশনেত্রী এ্যানী বেসান্ত মাদ্রাজের গবর্নরের হুকুমে অন্তরীণাবদ্ধ হন। তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তিনি স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সারা দেশে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন।

ভারত-সভা হলে আহূত প্রতিবাদ-সভায় চিত্তরঞ্জন এই অন্তরীণাদেশের বিরুদ্ধে অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা দেন। অতঃপর চিত্তরঞ্জন 'হোম রুল লীগে' যোগ দেন।

১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ 'রৌলট আইন' পাস হয়। ইহার বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা দেশে সত্যাগ্রহ ঘোষিত হয়। স্থির হইল, ৬ই এপ্রিল সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকিবে এবং সারা দিন অনশন ও প্রার্থনার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হইবে। এই দিন উপবাসী চিত্তরঞ্জন অক্টারলনি মনুমেণ্টের পাদদেশে দাঁড়াইয়া বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, "সত্যাগ্রহই প্রেমের শক্তি। যদি কেউ দেশকে ভালবাস, জাতিকে ভালবাস, তবে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলতে পারবে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'।"

মহাত্মা গান্ধীর প্রেমের শক্তিকে এই প্রথম চিত্তরঞ্জন মাথা পাতিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। এই বৎসর ২৩শে এপ্রিল স্যার মাইকেল ওডায়ার ও জেনারেল ডায়ারের হুকুমে জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়; একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান-শিখ জনতার রক্ত ক্ষরিত হয়। এই হত্যাকাণ্ড চিত্তরঞ্জনের বুকে শেলের মত বিদ্ধ হয়। তিনি ময়মনসিংহ সম্মেলনের বিষয়-নির্বাচনী সভায় সত্যাগ্রহ-প্রস্তাব গৃহীত করাইলেন। চিত্তরঞ্জন এই প্রস্তাব উত্থাপন-প্রসঙ্গে বলিলেন, "সর্বস্ব বিসর্জন দাও। নইলে এই খেলার প্রয়োজন নাই।"

১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড আইন (Reforms Act) বিধিবদ্ধ হয়। সেই বৎসর বড়দিনের অবকাশে কংগ্রেসের ইতিহাস-বিখ্যাত অমৃতসর অধিবেশনে চেম্‌সফোর্ড আইনের কিঞ্চিৎ সংস্কার ও উহা গ্রহণের পক্ষে মহাত্মা গান্ধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ছিলেন উহার বিপক্ষে। মহাত্মাজীর ধারণা ছিল, তাঁহাদের সংশোধন-প্রস্তাব সরকার মানিয়া লইবেন এবং জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তিবিধান হইবে।

দেশবন্ধুর সেই বিশ্বাস ছিল না। তিনি যুক্তি-তর্ক দ্বারা লোকমান্য তিলককে স্বমতে আনিলেন। অমৃতসর অধিবেশনে দুই পক্ষের এই মত-বিসংবাদে পরিবেশ সরগরম হইয়া উঠিল, গোলমালের সূচনা দেখা দিল। অবশেষে, উভয় পক্ষের মধ্যে আপস হওয়ায় দ্বন্দ্বের অবসান হইল।

পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, ভারতসরকার কংগ্রেসের কোন দাবিই গ্রাহ্য করেন নাই; অধিকন্তু জালিয়ানওয়ালাবাগের খুনী ব্যক্তিদিগকে পুরস্কৃত করিয়াছেন।

সারা দেশে ব্রিটিশের এই আচরণে অসন্তোষ তুষাগ্নির মত জ্বলিতেছিল। নেতাদের মধ্যে অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ করার আলোচনা চলিতে লাগিল। মহাত্মা গান্ধী ও মৌলানা শৌকত আলী দেশবন্ধুকে আইন ব্যবসায় ছাড়িয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে অনুরোধ করেন। কিন্তু, দেশবন্ধু পাঁচ বৎসর সময় চাহিলেন। গান্ধীজী বলিলেন, "দেশবন্ধু অগ্রসর না হইলে বাংলায় অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইতে বাধ্য।"

দেশবন্ধুকে গান্ধীজী বলিলেন, "এখনই ক্ষেত্র প্রস্তুত। জালিয়ানওয়ালাবাগ, খিলাফত, একবিন্দু ক্ষমতা প্রদান—ইহাই উপযুক্ত সুযোগ।"

দেশকে প্রস্তুত করার জন্য দেশবন্ধু পাঁচ বৎসর সময় চাহিতেছিলেন। উভয়ের মধ্যে মতৈক্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় মৌলানা মহম্মদ আলী আগাইয়া আসিলেন। শেষে উভয়ের মধ্যে মতৈক্য-প্রতিষ্ঠা হয়। দেশবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে গান্ধীজীর

সহিত একমত হইলেও আইন-সভায় ঢুকিয়া সরকারের কার্যে বাধা-দানের নীতিতে অটল ছিলেন।

১৯২১ সালে চিত্তরঞ্জন জাতীয় আন্দোলনে দেহ-মন ঢালিয়া দিলেন। ছাত্র-সমাজকে তিনি সাথীরূপে পাইলেন; সারা দেশে জাতীয়তাবোধ ও স্বরাজলাভের উদ্দীপনা দাবানলের মত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ছাত্র-সমাজকে তিনি দেহে, মনে ও বাক্যে অহিংসা-ব্রত গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন।

বাংলার ছাত্রসমাজ দেশবন্ধুর ডাকে অপূর্ব সাড়া দিল। গোটা বাংলা জুড়িয়া দেশপ্রেমের নূতন বান ডাকিল।

এই বৎসর জুন মাসে শ্রীহট্ট ও হবিগঞ্জ এলাকার চা-বাগানে ইংরেজ মালিকদের অমানুষিক নির্যাতনে অতিষ্ঠ হইয়া কুলীরা ধর্মঘট করিল এবং বাগিচা ত্যাগ করিয়া দেশ-যাত্রার পথে চাঁদপুর চলিয়া আসিল। আশ্রয়হীন কুলীর দল স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া পথে-ঘাটে পড়িয়া রহিল। কিন্তু প্রপীড়ক শাসকদের তাহা সহ্য হইতেছিল না। বাগিচা ত্যাগ করিয়া এতগুলি লোক এক সঙ্গে ধর্মঘট করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহাদের রক্ত নিঙাড়িয়া আর যদি মুনাফা লুটিতে পারা না যায়!

প্রতিশোধ-গ্রহণের স্পৃহা তাই ইংরেজ মালিক ও শাসকের মনে ক্রোধ-বহ্নি প্রজ্বলিত করিল। ইংরেজের বেতনভুক গুর্খাসৈন্য এই অসহায় কুলীদের উপর মারধর আরম্ভ করিল। চাঁদপুরের সাধারণ মানুষ স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভয় ও বিস্ময়ে সারা দেশ যেন বিমূঢ়! এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল রেল ও জাহাজ কোম্পানির কুলীরা। তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট ঘোষণা করিল।

কুলী-ধর্মঘটে কেরানীরাও যোগ দিলেন। চট্টগ্রামের জে. এম. সেনগুপ্ত এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন।

এই অত্যাচারের খবর দেশবন্ধুর কানে পৌঁছিল। ধর্মঘটের দরুন স্টীমার-চলাচল বন্ধ। অসহায় কুলীদের উপর মদান্ধ শোষক ও শাসকশ্রেণীর নির্যাতন! দেশবন্ধুর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। এই সঙ্কটকালে তাহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য তাঁহার হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। পারেন তো তিনি পদ্মায় ঝাঁপ দিয়া সাঁতার কাটিয়া চাঁদপুরে পৌঁছেন।

দেশবন্ধু দমিবার পাত্র ছিলেন না। স্টীমার সার্ভিস বন্ধ আছে, তিনি নৌকাযোগে ৫ই জুন গোয়ালন্দ হইতে চাঁদপুর রওনা হইলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, ঝড়-তুফানে প্রতিটি দিন সঙ্কটপূর্ণ। পদ্মাবক্ষে ঝড়ের তাণ্ডবনৃত্য যে কিরূপ ভয়াবহ, তাহা স্বচক্ষে যিনি না দেখিয়াছেন, তাঁহাকে বলিয়া বোঝানো যাইবে না। কিন্তু দেশবন্ধু অটল অবিচলিত। তিনি জীবনসঙ্গিনী বাসন্তী দেবীকে লইয়া ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পদ্মাবক্ষেই নৌকা ভাসাইলেন। দেশবন্ধুর নৌকা চাঁদপুরে পারে ভিড়াইবার পূর্বেই কুলীরা "সীতারাম" ধ্বনি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। তাহারা যেন তাহাদের আপন জনকে পাইল।

কুলীদের সাহায্যের জন্য তিনি 'তিলক স্বরাজ্য-ভাণ্ডার' হইতে দেড় লক্ষ টাকা দেন।

॥ পাঁচ ॥

ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ শাসক-শ্রেণীর তাচ্ছিল্য, রাজশক্তির হৃদয়হীন শাসন ও শোষণ, দেশবাসীর ক্রমবর্ধমান দুঃখ-দারিদ্র্য সারা দেশে তীব্র অসন্তোষ ধূমায়িত থাকা সত্ত্বেও হিংসার প্রশ্রয়ে যাহাতে জাতীয় আন্দোলন ধ্বংস না হয়, নেতাদের দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ ছিল। ১৯২১ সালের ১৭ই নভেম্বর প্রিন্স অব ওয়েলস ভারত-সফরে আসিলেন। এই দিন কংগ্রেসের নির্দেশে সারা দেশে 'হরতাল' পালন করা হয়। কিন্তু দেশবাসীর এই সাফল্য রাজ-কর্মচারীদের মনে আগুন ধরাইয়া দিল। ব্রিটিশ বণিক-সমিতির অভিযোগের ভিত্তিতে ১৯শে নভেম্বর প্রত্যূষে চারিদিকে খানাতল্লাসী আর ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হইল।

বণিকদের অভিযোগ ছিল এই যে, স্বেচ্ছাসেবকরা হরতালের দিন দাঙ্গা করিয়া শান্তিভঙ্গ করিয়াছে।

অধুনালুপ্ত 'ইংলিশম্যান' ও বর্তমান 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' সেই দিনের নির্যাতন-অভিযানে যথেষ্ট ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। কলিকাতায় তিন মাসের জন্য সভা-শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হইল।

নেতৃবৃন্দ 'সত্যাগ্রহ' আরম্ভ করার সিদ্ধান্ত করিলেন। কংগ্রেস কর্তৃক আইন-অমান্যের প্রস্তাব গৃহীত হইল। ১লা ডিসেম্বর (১৯২১) দেশবন্ধু নিজেকে আইন-অমান্যের একজন স্বেচ্ছাসেবক বা সৈনিকরূপে ঘোষিত করিয়া দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাইলেন ঃ **"ধৈর্যের সহিত আপনারা সমস্ত অত্যাচার সহ্য করিবেন। হিংসার আশ্রয় লইবেন না।"**

"আমি আশা করিতেছি, অবিলম্বে লক্ষাধিক স্বেচ্ছাসেবক বাংলায় কাজ করার জন্য ছুটিয়া আসিবে।"

কারাদণ্ড অনিবার্য মনে করিয়া দেশবন্ধু এই সময় হইতেই কৃচ্ছ্রতার অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আহারে বসিয়া পাচক ঠাকুরকে বলিলেন, "জেলে গিয়ে ত কাঁকর-মিশানো ভাত খেতে হবে। আমার ভাতে কাঁকর মিশিয়ে দিও।

বাংলাদেশে অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ হইলে, গোড়ার দিকে কারাবরণ ও হাসিমুখে নির্যাতন বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত স্বেচ্ছাসেবকের অভাব দেখিয়া দেশবন্ধু বেদনা অনুভব করিলেন। কিন্তু, তাঁহার একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনকে আগাইয়া আসিতে দেখিয়া তিনি হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, "আজ আমার জীবন সার্থক। আমার যা কিছু প্রিয়তম, স্বদেশব্রতে তা আজ উৎসর্গ করতে পারব।"

চিররঞ্জনের কারাবরণের পরে বাসন্তী দেবীর পালা। ২৪শে ডিসেম্বর হরতাল হইবে এই ঘোষণা করিতে করিতে এবং খদ্দর-বিক্রয়রত অবস্থায় তিনিও গ্রেফতার হইলেন। তাঁহার সঙ্গে গেলেন ঊর্মিলা দেবী ও সুনীতি দেবী! চিত্তরঞ্জন অটল, হিমাচলেরই মতো অবিচলিত। পুত্র চিররঞ্জন ও পত্নী বাসন্তী দেবীর কারাবরণে তিনি এতটুকু চঞ্চল হইলেন না।

অসহযোগ আন্দোলনের সূচনায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মন ছিল কাপুরুষতার পঙ্কে নিমজ্জিত। সেই ভীরুতায় আচ্ছন্ন যুগে মহিলাদের কারাবরণ কম সাহসিকতা নয়। কেহ কেহ বাসন্তী দেবীর নিকট জামিনের প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তিনি তাহা 'অবমাননাসূচক' বলিয়া তিরস্কার করিলেন। বীর দেশপ্রেমিকের

বীরজায়া! গ্রেফতারের দিন রাত্রি ১২টায় বাসন্তী দেবীকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু, ইহার পশ্চাতে তাঁহার কোনও আত্মীয়ের তদ্বির রহিয়াছে জানিতে পারিয়া বীরজায়া বাসন্তী দেবী পরদিবস পুনশ্চ কারাবরণ করিলেন। এই সংবাদে বাংলার হৃদয় মথিত হইয়া উঠিল।

হাজার হাজার তরুণ-তরুণী স্বেচ্ছাসেবকের বেশে পুলিসের হাতে প্রহৃত হইয়া গ্রেফতার বরণ করিতে লাগিল। ছাত্রসমাজে ভয়-সঙ্কোচের বাঁধ টুটিয়া গেল। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে সেইদিন এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় আলোড়িত হইয়া উঠিল।

১৯২১ সালের ১০ই ডিসেম্বর দেশবন্ধুকে ফৌজদারী সংশোধন আইনে গ্রেফতার করিয়া প্রেসিডেন্সি জেলে লইয়া যাওয়া হইল। ১৯২২ সালের ১৪ই ফেব্রুআরি ব্যাঙ্কশাল আদালতে তাঁহার বিচার হইল এবং ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। দণ্ডাদেশের পর তাঁহাকে সেন্ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হইল। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকা কালেই তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এখানে অসুখ বাড়িয়া গেল। তিনি পুনঃ পুনঃ জ্বরে আক্রান্ত হইতে লাগিলেন। তাঁহার দেহের ওজন কমিয়া গেল।

জেলে বন্দী থাকাকালেও দেখা গিয়াছে, তাঁহার দেশানুরাগে কোথাও কৃত্রিমতা ছিল না। তিনি দেশ বলিতে বিশেষ একটা ভূখণ্ড, শস্যশ্যামল প্রান্তর, কলনাদিনী স্রোতস্বতী, বিচিত্র বিহঙ্গকুলের সুমধুর কূজন, কবি-বর্ণিত শরতের নীল আকাশ আর শিউলি ফুলের সৌরভে আমোদিত প্রত্যূষকাল বুঝিতেন না। এই দেশের

দরিদ্র মানুষের সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ের ছিল নিবিড় সংযোগ। তিনি ছিলেন একেবারে বাংলার মাটির মানুষ। চৈতন্য, রাম-মোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের অস্থি-মজ্জা ও অন্তঃকরণ যে নদীর জল, যে গাছের ফল ও যে সুরভির স্তন্যধারায় সৃষ্টি ও পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিল, 'ব্যারিস্টার দাশ সাহেবের' অস্থি-মজ্জা ও অন্তঃকরণ সেই একই উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। 'আপনি আচরি' ধর্ম পরেরে শিখাবে'—শ্রীচৈতন্যের এই বাণী তাঁহার মর্মে গাঁথা ছিল। তাই জেলখানায় তিনি বিশেষ শ্রেণীর সুবিধার দাবি করেন নাই। আর সকল বন্দীর সঙ্গে থাকিতে তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কারা-প্রাচীরের অন্তরালে থাকিয়াও পল্লী-বাংলার জন্য তাঁহার উদ্বেগের অবধি ছিল না। তিনি বলিলেন, "গ্রামের লোকদের নিকট হইতে এক টাকা করিয়া দশ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলে পল্লী-গঠনের কাজ আরম্ভ করা চলে।"

তাঁহার জেলে থাকা কালে চট্টগ্রামে রাজনৈতিক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনের সভানেত্রীরূপে বাসন্তী দেবী আইনসভায় প্রবেশের কথা সর্বপ্রথম বলেন। ইহাতে চারিদিক হইতে প্রতিবাদের ঝড় উঠিল।

তিনি বলিলেন, "আইন-সভা বয়কট করিয়া নয়, আইন-সভায় ঢুকিয়া আমরা ব্রিটিশের জন-বিরোধী আইন প্রণয়ন-চেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবল বাধা দিব; আমলাতন্ত্রের শয়তানী উদ্দেশ্যকে বানচাল করিয়া দিব।"

তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, আমলতন্ত্র এই দেশের কোন হিত-সাধনই করিতে পারে না। আর সংস্কার? দুর্ভিক্ষ লাগিলে মুষ্টি-

ভিক্ষা, মহামারী লাগিলে দাতব্য চিকিৎসালয়, এইসব কাজ দ্বারা আমলাতন্ত্র দেশের লোককে ধোঁকা দেয় মাত্র।

স্বরাজ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে চিত্তরঞ্জনের একটা স্বতন্ত্র ধারণা ছিল। তিনি স্বরাজকে স্বাধীনতার চেয়ে উচ্চে স্থান দিতেন। তাঁহার মতে স্বরাজ সমস্ত শ্রেণী-ভেদ দূর করে। তাই তিনি বলিতেন, "I want Swaraj for the masses and not for classes."

১৯২২ সালের ৯ই অগস্ট চিত্তরঞ্জন মুক্তিলাভ করেন।

॥ ছয় ॥

জেল হইতে মুক্তিলাভের পর দেশবন্ধু লুপ্তস্বাস্থ্য-উদ্ধারের জন্য দার্জিলিং যান। জেলের কৃচ্ছ্রতা তাঁহাকে বড়ই দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সময় তিনি রক্তাল্পতা ও অল্প অল্প জ্বরে ভুগিতেছিলেন। দার্জিলিং-এ অভীপ্সিত ফললাভ না হওয়ায় অতঃপর তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্য কাশ্মীর গমন করেন। কাশ্মীরের অন্তর্গত মারীর অপরূপ নৈসর্গিক শোভা তাঁহার মনকে মুগ্ধ করিল। ক্রমে এখানে তাঁহার শরীরও সুস্থ হইতে লাগিল।

মারী হইতে তিনি ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। এইবার কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনে তাঁহারই সভাপতিত্ব করার কথা। সমস্ত দেশ অসহযোগ নীতির পক্ষে, আর, দেশবন্ধু একা আইন-সভায় প্রবেশের পক্ষে। দেশব্যাপী বাদানুবাদ আরম্ভ হইল। দেশবন্ধু অটল। কোন ব্যাপারে কেহ যদি তাঁহাকে বলিতেন, "এ অসম্ভব ব্যাপার, আপনি ইহা পারিবেন

না।" অমনি তিনি বলিতেন, "আমার স্বভাবই হচ্ছে, যা অসম্ভব, তার পিছনে ছুটে যাওয়া, আমার মন অসম্ভবকে সম্ভব করতে চায়, যতদিন বাঁচব, তা-ই করব।"

তাঁহার কাউন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাবে চতুর্দিক হইতে ধিক্কার ধ্বনিত হইতে লাগিল। লোকে তাঁহাকে 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দিতেও ছাড়িল না, কেহ বা তাঁহাকে 'মন্ত্রী-পদলোভী' বলিয়া ভর্ৎসনা করিল।

দেশবন্ধু তাঁহার কাজের সুবিধার জন্য এই সময়ে 'বাঙ্গলার কথা' নামক দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

গয়া-কংগ্রেসে তাঁহার আইন-সভায় প্রবেশ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল। গয়া-কংগ্রেসের অভিভাষণেও তিনি 'সবার উপরে মানুষ বড়'র ন্যায় সকলের উপরে পল্লীর স্থান দিলেন।

বলিলেন, "গ্রাম-সংগঠনের উপরেই স্বরাজের ভিত্তি, প্রাচীন ভারতের পঞ্চায়েত শাসন-প্রণালীরই রূপান্তর স্বরাজসাধনা। জনসাধারণের দ্বারা শাসিত জনসাধারণের জন্য স্বরাজ ভারতের খাঁটি স্বরাজ।"

স্বদেশী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধেও গয়া-কংগ্রেসের ভাষণে তাঁহার কঠোর মন্তব্য ছিল। তিনি বলিলেন, "আমি গ্রামের সুখ ও স্বাধীনতাই আগে চাই। বর্তমান আমলাতন্ত্রের স্থানে স্বদেশী আমলাতন্ত্র ক্ষমতাধিকারী হউক, ইহা আমি চাই না। আমি চাই সকলের সমান অধিকার।"

গয়া-কংগ্রেসে তাঁহার পরাজয়ের পরও তিনি বলিলেন, "আজ আমার কথা অধিকাংশ লোকের নিকট অপ্রিয় মনে হইতে পারে, কিন্তু আমি আশা ছাড়ি নাই। অধিকাংশ দেশবাসী

আমার কথা সমর্থন করিবেন—এমন দিন আসিবে, এই আমার বিশ্বাস।”

আত্মপ্রত্যয় সর্বদা তাঁহার মনে অকম্পিত থাকিত। তিনি বলিতেন, “ব্যর্থতা ? জীবনে কখনও ব্যর্থ হই নাই, হইব না।”

গয়া-কংগ্রেসের পর দেশবন্ধু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ত্যাগ করিয়া ‘কংগ্রেস-খিলাফত স্বরাজ পার্টি’ গঠন করেন। পরে ইহারই অপর নাম হয় ‘স্বরাজ্য দল’। বাংলাদেশে এই দলে যোগদান করিলেন, জে. এম. সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, কিরণশঙ্কর রায়, সাতকড়িপতি রায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্রতাপ গুহ রায়, বসন্তকুমার মজুমদার ও তদীয় পত্নী হেমপ্রভা মজুমদার।

অতঃপর দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কাউন্সিলে প্রবেশের উদ্যোগ আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি প্রচারকার্যোপলক্ষে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ, ভেলোর, কঞ্জীবরম, কাভেলোর, কুম্ভকনাম, চিদাম্বরম, মাদুরা, চিতোর, নেলোর, ত্রিচিনপল্লী প্রভৃতি স্থানে সফর করেন।

১৯২৩ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সভাপতিত্ব করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে কাউন্সিল-প্রবেশের প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্থির হইল যে, বাধাপ্রদানের উদ্দেশ্যে কাউন্সিলে প্রবেশ করা হইলে কংগ্রেস সেই নির্বাচনে অন্তরায় সৃষ্টি করিবে না।

কংগ্রেসের সম্মতি লাভ করিয়া সংগ্রামে তিনি অদম্য প্রেরণা

পাইলেন। কাউন্সিলে প্রবেশের আন্দোলন তাঁহাকে আহার-নিদ্রা ভুলাইয়া দিল।

নরমপন্থী নেতা সুরেন্দ্রনাথকে তাঁহার দলের নিকট পরাজয় বরণ করিতে হইল।

নির্বাচনে শুধু কঠোর শ্রমস্বীকার নয়, তাঁহাকে প্রচুর অর্থও ব্যয় করিতে হইল। নির্বাচনের সাফল্যলাভের মূল্যস্বরূপ তাঁহাকে তাঁহার অমূল্য স্বাস্থ্য ও ষাট হাজার টাকা বিসর্জন দিতে হইল। এইবার তিনি রিক্তহস্ত হইলেন।

বাংলার লাট-পদে এই সময় অধিষ্ঠিত ছিলেন লর্ড লিটন। লিটন তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন, "অখণ্ড ক্ষমতা প্রদত্ত না হইলে তিনি এই আমন্ত্রণ-গ্রহণে অক্ষম।"

আইন-সভায় প্রায় সর্ববিষয়ে তিনি প্রভূত সাফল্য লাভ করেন। সরকারপক্ষ বারবার তাঁহার নিকট পরাজিত হয়।

১৯২৪ সালে দেশবন্ধু কলিকাতা কর্পোরেশনের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং ইহাতে কংগ্রেস-প্রার্থীদের বিরাট সাফল্য-লাভ হয়। তিনি কর্পোরেশনের মেয়র হন।

শুধু রাজনীতি বলিয়া নহে, দেশের যেখানে যে অন্যায় ও অত্যাচার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইত, সেইখানেই তিনি মানবতার সেবায় ছুটিয়া যাইতেন।

কর্পোরেশনের শাসন-ক্ষমতা দখল করা হইতে আরম্ভ করিয়া তারকেশ্বর তীর্থসংস্কার-কার্য পর্যন্ত তাই তিনি অকাতরে তাঁহার অনলস কর্মশক্তি বিস্তার করিয়া দেন। সেই সময়কার স্বেচ্ছাচারী

মোহান্তের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ শোনা যাইত। মোহান্ত রাজার হালে থাকিতেন। তাঁহার ভোগদখলে বিরাট ভূ-সম্পত্তি। এই ধর্মস্থানে দুর্নীতি ও যথেচ্ছাচার দেশবাসীর মনে যৎপরোনাস্তি ঘৃণার সঞ্চার করিয়াছিল। মোহান্তের প্রাসাদের নিকটবর্তী লক্ষ্মী-নারায়ণ জীউর মন্দিরে সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

দেশবন্ধু এইসব অনাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকরা এই আন্দোলনে অগ্রসর হইল এবং কারাবরণ করিল। দেশবন্ধু অক্লান্ত শ্রমস্বীকার করিয়া আন্দোলন সংগঠন করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র চিররঞ্জন এইবারও কারাবরণ করেন।

আন্দোলনের ব্যাপকতা দেখিয়া মোহান্তজী ভয় পাইয়া গেলেন। তিনি গদি ছাড়িয়া দিতে এবং আপস করিতে রাজী হইলেন।

শুধু তাহাই নহে, সমস্ত দেবোত্তর সম্পত্তি জনসাধারণ ও যাত্রিসাধারণের হিতার্থে ব্যয় করিতেও তাঁহার সম্মতি পাওয়া গেল। কিন্তু ব্রাহ্মণ-সভার নেতৃবৃন্দ এই পথে বাধা সৃষ্টি করিলেন।

॥ সাত ॥

আইন ব্যবসায় আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের সমস্ত বোঝা চিত্তরঞ্জনের কাঁধে চাপিল, এই কথা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। এই সময়ে কঠোর দৈন্য ও দুর্দৈবের বিরুদ্ধে অমিতবিক্রমে তিনি সংগ্রাম করিতে থাকেন। এই সংগ্রামে তাঁহার অপরাজেয় মনুষ্যত্ব ও শার্দূলসম শৌর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনে কখনও তিনি প্রতিকূল অবস্থার নিকট নতশির হন নাই। কঠোর দারিদ্র্যের পীড়ন তাঁহাকে কদাপি নিরুদ্যম করিতে পারে নাই। অবশেষে তাঁহার অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় জীবনে তাঁহাকে সাফল্যের স্বর্ণ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিল। অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল।

তখন ধীরে ধীরে তিনি পিতার সকল ঋণ পরিশোধ করিলেন। দেউলিয়া নাম লেখাইবার পর তিনি এই ঋণ আইনতঃ শোধ না করিলেও পারিতেন। কিন্তু ইহা শোধ না করিয়া তিনি তাঁহার বিবেকের বৃশ্চিক-দংশনজ্বালা সহিবেন কেমন করিয়া? দুই-এক হাজার নয়, চৌষট্টি হাজার টাকার ঋণ শোধ করিয়া তিনি দেউলিয়া নাম ঘুচাইলেন।

পিতৃঋণ-পরিশোধের পর দুঃস্থ দেশবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য-মোচনের জন্য তিনি উপার্জিত অর্থ জলের মত দান করিয়াছেন। নিজে দারিদ্র্যের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়া, অমানুষিক কৃচ্ছ্রতা স্বীকার করিয়া সুখের মুখ দেখিয়াছেন, তাঁহার যশের অভাব নাই, অর্থ অপ্রার্থিত ও অপ্রত্যাশিতরূপে তাঁহার হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

অনায়াসে তিনি সংসারের আর দশজনের মত সেই বিপুল অর্থরাশি দিয়া নিজ বৈভবকে আকাশচুম্বী করিয়া তুলিতে পারিতেন। অন্যান্য সাধারণ আইন-ব্যবসায়ীর ন্যায় তিনিও অর্থসঞ্চয় করিতে পারিতেন। কিন্তু অন্যান্য প্রচুর উপার্জনশীল ব্যক্তির সঙ্গে তাঁহার চরিত্রের ছিল বিশাল পার্থক্য।

প্রতি মাসে অজস্র অর্থ অর্জন করিয়াও তিনি সঞ্চয়ের কথা মনে ঠাঁই দিতেন না। শুধু বাংলায় কেন, সমগ্র ভারতে এই দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁহারই সমসাময়িক কালে আরও অনেক প্রখ্যাত ব্যবহারজীবীই ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মত এমন অকাতরে অর্থ দান আর কে করিয়াছেন?

যে ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল হইতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা-নির্বাহের ক্ষেত্রে দুর্দৈবের কিছু অভাব দেখা যায় না, যে সমাজে মনুষ্যত্বের অপহ্নব প্রতিনিয়ত দৃষ্টিগোচর হয়, সেই গাঢ় তমিস্রায় আবৃত দেশের আকাশে চিত্তরঞ্জন ছিলেন উজ্জ্বল ভাস্কর-স্বরূপ। সাগরের ন্যায় এমন উদার প্রশান্ত হৃদয় আর কাহার দেখা যায়?

সংসারের কলকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও, তাঁহার অন্তর ছিল পদ্মপত্রের মত নির্লেপ, নিষ্কলুষ। আপন সুখ, আপন আরাম, আপনার ভোগৈশ্বর্য-বৃদ্ধির লিপ্সা বা মদোন্মত্ততা কোনদিন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। দেশের মানুষকে তিনি কতই না ভালবাসিতেন! তিনি তাই অকাতরে আপন অর্জিত অর্থ তাহাদের মধ্যে বিলাইয়া দিতে পারিতেন।

হিমালয়-শিখর-স্খলিত গঙ্গা-বারি-প্রবাহের ন্যায় তিনি উচ্ছল

তরঙ্গে হাসিতে-হাসিতে এই দেশের বুকে ভাসিয়া আসিয়াছিলেন ; আবার সেই কলুষনাশী গঙ্গার খরস্রোতের মতই তিনি এই দেশের লোকের ক্লীবতা ও ভীরুতাকে প্রাণের প্রচণ্ড স্রোতে ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া গেলেন! এত প্রেম, এত প্রাণ এ দেশের লোক শ্রীচৈতন্যের পরে আর কোথাও দেখিয়াছিল কি? এত প্রীতি, এত দয়া, আর দান করিতে করিতে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়ার দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয়টি আছে কি? তাঁহার প্রাণের প্রেমের ধারায় স্নান করিয়া তাপিতের হিয়া শীতল হইয়াছে, সেই প্রেম-যমুনার তটে বিটপীর শীতল ছায়ায় দাঁড়াইয়া তৃষ্ণার্ত মানুষ অঞ্জলি ভরিয়া অমিয়-বারি পান করিয়াছে। যাহার যত প্রয়োজন, তিনি তাহাই পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার এই মহিমময় চরিত্র-লাবণ্য বুঝি সহস্র চন্দ্রের আলোকেও ম্লান করিয়া দেয়!

দানে কখনও তাঁহার কুণ্ঠা ছিল না। ছিল না গণিতের হিসাব, হিসাবীর নিকাশ। একবার এক মামলায় ফি বাবদ অনেকগুলি রূপার টাকা তাঁহার বাড়ীতে আসে। সেই অগণিত টাকার সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হইবে। কয়েকজন কর্মচারী উহা গুণিতে বসিয়া গেলেন। দেশবন্ধু সেখানে আসিয়া হাসিতে হাসিতে সকলকে বলিলেন, "যে যত পার, তোমরা আঁচল ভরিয়া লও।"

এক ভদ্রলোককে তাঁহার পাশেই নির্বাক বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি নিজ হাতে তাঁহাকে দুই আঁজলা ভরিয়া টাকা তুলিয়া দিলেন। দুঃখীর দুঃখ-মোচনে ছিল তাঁহার অপরিসীম ব্যাকুলতা! কাহাকেও অল্প দিয়া তিনি কিছুতেই তৃপ্তি বোধ করিতেন না। এমন দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনে বহু আছে!

* * * *

১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে একবার তিনি বায়ু-পরিবর্তনের জন্য সপরিবারে মায়াবতী যান। এখানে কিছুকাল অবস্থানের পর তাঁহার হৃতস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার হয়। পাহাড়ের অনির্বচনীয় মনোরম দৃশ্য, স্নিগ্ধ শীতল পরিবেশের ব্যস্ততাহীন অচঞ্চল দিবস-রজনী তাঁহার দেহকে নিরাময় করিয়া তুলিল। শেষে কর্মব্যস্ত পৃথিবীর আহ্বান আসিল। তিনি দেশমুখী হইলেন। পাহাড়ের মধ্য দিয়া চড়াই-উৎরাইয়ের পথ। অচেনা অপরিসর পায়ে চলার রাস্তা। তিনি ডাণ্ডির সোয়ারী হইয়াছেন। তাঁহার ডাণ্ডি কিছুদূর অগ্রসর হইতেই পাহাড়ী বালক-বালিকারা হাতে বনফুলের গুচ্ছ লইয়া দলে দলে রাস্তার পাশে দাঁড়াইয়া আছে 'রাজাজী'র অভ্যর্থনার জন্য। পুষ্প-গুচ্ছগুলি চিত্তরঞ্জনের হাতে উপহার দিয়া তাহারা ডাণ্ডির পিছনে ছুটিল। চিত্তরঞ্জন বুঝিলেন, তাহারা বক্‌শিস চাহিতেছে। তিনি সঙ্গের অ্যাটাচি-কেস্ খুলিয়া প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া টাকা দিতে লাগিলেন।

তাহাদের জীবনে এ এক অভিনব ঘটনা। এই পথে স্বাস্থ্যান্বেষণ করিতে অনেকেই আসেন এবং হৃতস্বাস্থ্য-উদ্ধারের পর অনেকেই আবার নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সকলের কাছেই এই ছেলে-মেয়ের দল বক্‌শিসের লোভে হাত পাতিয়া থাকে। কিন্তু কাহারও নিকটই তাহারা এক টাকা করিয়া কখনও পায় নাই। দুই-এক আনাতেই তাহারা অভ্যস্ত এবং উহাই তাহারা যথেষ্ট মনে করে। চিত্তরঞ্জনের হাত হইতে রূপার মুদ্রা পাইয়া যেন তাহারা বিশ্বাস করিতেই পারিল না, ইহা কি করিয়া তাহাদের বক্‌শিস হইতে পারে!

ক্রমে এই রাজসিক বক্‌সিসের বার্তা এক মুহূর্তে দাবানলের মত পাহাড়ের দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িল! "রাজাজীকী জয়" ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিয়া তাহারা দল বাঁধিয়া ছুটিল চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডির দিকে। কেহ দুইবার পুষ্পগুচ্ছ দিয়া দুইবারই টাকা লইতেছে কিনা, সে সন্ধানের স্পৃহা তাঁহার ছিল না। তিনি একটি করিয়া পুষ্পগুচ্ছের বদলে একটি করিয়া টাকা বিতরণ করিয়া চলিলেন।

* * * *

১৯১১ সালে চিত্তরঞ্জন একবার ময়মনসিংহ যান। এই সময় জনৈক কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্রলোক তাঁহার নিকট অর্থ-সাহায্য চাহিলে তিনি তাঁহার হাতে এক হাজার টাকার একখানি চেক প্রদান করেন। এক হাজার টাকার চেক দেখিয়া উপস্থিত অপর এক ভদ্রলোক দেশবন্ধুকে বলিলেন: "দেখুন ত আপনার ভুল হ'লো কি না। আপনি বোধ হয় এক শত লিখতে এক হাজার লিখে ফেলেছেন।" চিত্তরঞ্জন অমনি বলিলেন, "না, আমি ঠিকই লিখেছি।"

* * * *

চিত্তরঞ্জনের দানের কিছু সীমা-সংখ্যা ছিল না। কেহ হয়ত পয়সার অভাবে রুগ্‌ণ শিশুর ঔষধ কিনিতে পারিতেছে না, কোন গুণী সাহিত্যিকের সংসার অচল হইয়া পড়িয়াছে, কবির দেহ রোগ-যাতনায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, জনহিতকর কোন প্রতিষ্ঠান অর্থাভাবে অভীষ্টসিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, চিত্তরঞ্জনের কানে সেই খবর পৌঁছিলে তিনি তাঁহাদের দৈন্যমোচনে অগ্রসর না হইয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিতেন না।

* * * *

কোর্টে যাইবেন, গাড়িতে পা দিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময় এক অসহায়া মাতা রুগ্‌ণ শিশুকে কোলে করিয়া আসিয়াছে, হাতে ঔষধের প্রেসক্রিপশান, চিত্তরঞ্জনের দ্বারে সাহায্যপ্রার্থী। বেশী নয়, মাত্র আড়াই টাকা হইলেই তাহার শিশুটির ঔষধ কেনা হইয়া যায়। চিত্তরঞ্জন অমনি একটি দশ টাকার নোট তাহার হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

* * * *

কন্যাদায়গ্রস্ত কোন ভদ্রলোক সকালে মাত্র একশত টাকা সাহায্য চাহিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে টাকা পাঠাইয়া দিবেন, বলিয়াছিলেন। সারা দিনে কর্মব্যস্ততার মধ্যে তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রাত্রিতে ভদ্রলোকের মেয়ের বিবাহ। বিবাহের আসরে পণের টাকা অবশ্য দেয়। কর্মশেষে শয্যার আশ্রয় লইতে যাইয়া সেই কথা তাঁহার মনে পড়িল। অমনি তিনি বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার কর্মচারীকে ডাকিয়া সত্বর সেই টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

* * * *

একবার আলমোড়ার পার্বত্য অঞ্চলে কয়েকজন কুলীকে তিনি আড়াই টাকার স্থলে ১০৲ টাকা মজুরি দেন। দশ টাকার নোট পাইয়া কুলীর সর্দার যেন হতভম্ব হইয়া গেল। আর সাড়ে সাত টাকা দিয়া সে কি করিবে? বারবার এই প্রশ্নই সে চিত্তরঞ্জনকে করিতেছিল। তিনি যে এই টাকা তাহাকে বক্‌সিস হিসাবে দিয়াছেন, কিছুতেই তাহাকে তাহা বুঝাইতে পারিতেছিলেন না।

সে যখন তাহা বুঝিল, তখন দুই হাত মাথায় ঠেকাইয়া সে চিত্তরঞ্জনকে বারবার প্রণাম জানাইল।

* * * *

পূর্ববঙ্গে যাওয়ার পথে একবার গোয়ালন্দ স্টীমারে তিনি প্রথম শ্রেণীতে বসিয়া দুই দিকের পদ্মাতীরের সৌন্দর্য অবলোকন করিতেছিলেন, এমন সময় জীর্ণবস্ত্র-পরিহিত এক ভদ্রলোক তাঁহার নিকট সাহায্যপ্রার্থী হন। ক্রমে তিনি জানিতে পারিলেন, ভদ্রলোক তাঁহারই বাল্যবন্ধু। বন্ধুটি কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া সাহায্যের জন্য অসহায়ের মত ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছেন। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে মাত্র তিনহাজার টাকা ছিল। তিনি তাহা হইতে দেড় হাজার টাকা দরিদ্র বাল্যবন্ধুকে দিয়া দিলেন।

* * * *

কাহারও কন্যাদায়, কাহারও ছেলের উপনয়ন, কাহারও ব্যাধি-পীড়া, কাহারও শিক্ষা চলে না, কাহারও বা ব্যবসায় অচল—সকলের বোঝা তিনি লাঘব করিয়া দিতেন; তাঁহার কল্যাণহস্ত আর্তের অশ্রুমোচনের জন্যই যেন উদ্যত হইয়া থাকিত।

"তিনশত টাকা হলেই আমার মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়, আমি দাশ সাহেবের কাছে এই টাকাটার সাহায্য চাইতে এসেছি।"—বলে একবার এক ভদ্রলোক তাঁহার শরণাপন্ন হন। তিনি তাঁহাকে পাঁচশত টাকার একখানি চেক প্রদান করেন।

* * * *

প্রতি মাসে তাঁহার নির্দিষ্ট কতকগুলি দান ছিল। দরিদ্র

আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আরও নানারকম প্রার্থীকে তিনি মাসিক দেড় হইতে দুই হাজার টাকা মনিঅর্ডার করিতেন।

পূর্ববঙ্গের স্বাভাবকবি গোবিন্দ দাসের শেষজীবনে তাঁহার চিকিৎসার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কত বক্তা, গায়ক, দেশসেবক, সাহিত্য-সাধককেও যে তিনি অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, তাহার সীমা-সংখ্যা নাই। পরের দুঃখের কাহিনী শুনিলে তিনি চোখের জল না ফেলিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না।

* * * *

সুসাহিত্যিক উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে একবার এক বৈরাগী চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবির গান শুনাইয়া চিত্তরঞ্জনকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলী ও গীতিকাব্য তাঁহার খুব প্রিয় ছিল। সাধারণ বৈরাগী, বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া একতারা লইয়া এমন উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত বিতরণ করে। চিত্তরঞ্জন তাহার সুমধুর কণ্ঠে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কেরানী বৈরাগীর হাতে দুইটি দশ টাকার নোট পারিশ্রমিক বাবদ দিয়া গেল। বৈরাগী ত অবাক্। পথে পথে, ঘরে ঘরে গান গায় আর ভিক্ষা করে, সেই লোক বিশ্বাসই করিতে পারিতেছিল না এই কুড়ি টাকা কেমন করিয়া তাহার পারিশ্রমিক হয়। অধিকন্তু, চিত্তরঞ্জন তাহাকে বলিয়া দিলেন, সপ্তাহে এক দিন করিয়া যেন সে তাঁহাকে গান শোনাইয়া যায়; তিনি তাহাকে মাসিক বিশ টাকা পারিশ্রমিক দিবেন।

* * * *

সাহিত্যিকদের সাহায্য এবং সৎসাহিত্যের প্রচার-মানসে তিনি

নিজ সম্পাদনায় 'নারায়ণ' পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রতি সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়ীতে সাহিত্যিক, গায়ক প্রভৃতি গুণী ব্যক্তিদের লইয়া একটি মজলিস বসিত। এই মজলিসে সেই সময়ের অনেক গুণী সজ্জনই উপস্থিত থাকিতেন, এই সান্ধ্য মজলিসে যোগদানকারী সকলেই চিত্তরঞ্জনের আতিথেয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন। মজলিস-অন্তে কেহই তাঁহার গৃহ হইতে ভূরি-ভোজনে পরিতৃপ্ত না হইয়া পরিত্রাণ পাইতেন না। সঙ্গীত ও সাহিত্য-আলোচনায় প্রায়ই অনেক রাত্রি হইয়া যাইত।

শুধু কি সাহিত্য-আলোচনা ? কীর্তনগান তাঁহার প্রিয় ছিল; অধুনালুপ্ত বিখ্যাত মাসিকপত্র 'বিচিত্রা'-সম্পাদক এই আসরে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করিতেন। তাঁহার সহিত দেশবন্ধুর পরিচয় হয় ভাগলপুরে। পরিচয় পরে ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতায় পরিণত হয়।

উপেন্দ্রবাবু মধুর কণ্ঠে কীর্তন পরিবেশন করিয়া আসর সুরু করিতেন।

দেশবন্ধু বলিতেন, "সন্ধ্যার পর আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন ; কোন কাজকর্মকে আমল দিই না। সন্ধ্যার পর এই বৈঠকখানা আর লক্ষ্মীর এলাকায় থাকে না, সরস্বতীর এলাকায় আসে। আপনারা প্রতিদিন দয়া করে এসে এখানে ইষ্ট-গোষ্ঠী করবেন। ভালো করে বাঁচতে হলে এরূপ মেলামেশার খুব প্রয়োজন আছে। নইলে জীবন শুকিয়ে যায়। সরসতাই যদি না থাকলো, তবে এই জীবনের ভার বহন করে কি লাভ ?"

সঙ্গীত ও সাহিত্যের আসরেও তিনি ব্যাঙ্কের চেক-বই আনাইতেন। এখানে এমন অনেক গুণী ব্যক্তির সমাবেশ হইত,

যাঁহাদের দারিদ্র্যের খবর তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। চেকের পাতায় তিনি অঙ্ক লিখিয়া ও সহি করিয়া নীরবে তাহা কাহারও পকেটে গুঁজিয়া দিতেন। তাঁহার দানের কথা অপরে না জানুক, ইহাই ছিল তাঁহার অভিলাষ। তাই এখানেও তিনি দানগুপ্তি পালন করিতেন।

কবি শ্রীকালিদাস রায়, গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী, কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই আসরে উপস্থিত থাকিতেন।

কালিদাস বাবু এই আসর-প্রসঙ্গে একস্থানে বলিয়াছেন, "যে-সকল সাহিত্যিক 'নারায়ণে'র সংসর্গে এসেছিলেন, তাঁরা সকলেই অর্থসাহায্য পেয়েছিলেন। 'নারায়ণে' লেখার জন্য তিনি যে-পরিমাণ দক্ষিণা দিতেন, সে-পরিমাণ দক্ষিণা আজ পর্যন্ত কেউ দেয় নি। দক্ষিণাটা তাঁর কাছে বড় কথা নয়, দাক্ষিণ্যটাই বড় কথা। লেখার নাম ক'রে সাহিত্যিকদের সাহায্য করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এমন কি 'নারায়ণ' পত্রিকা-প্রকাশই সাহিত্যিকদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে—একথা বললেও অসঙ্গত হয় না।"

* * *

দান করিতে করিতে চিত্তরঞ্জন সম্রাট অশোকের ন্যায় নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। শেষে তাঁহার কলিকাতাস্থ রসা রোডের বসতবাটি পর্যন্ত তিনি সৎকার্যের জন্য ট্রাস্টীর হাতে অর্পণ করিয়া যান।

॥ আট ॥

চিত্তরঞ্জন খুব ভোজনবিলাসী ছিলেন। দেহ ব্যাধিজীর্ণ হওয়ার পূর্বে যৌবনে তিনি পেট ভরিয়া মাংস-পোলাও ভক্ষণের পরেও দুই-এক সের রসগোল্লা অনায়াসে খাইতে পারিতেন। চিতল ও ইলিশ মাছ তাঁহার বড়ই প্রিয় খাদ্য ছিল। তিনি নিজে যেমন খাইতে পারিতেন, অপরকেও তেমনি খাওয়াইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। অতিথিসৎকার, স্বজনবাৎসল্য, দশজনকে লইয়া একত্রে বসিয়া আহার করায় তিনি প্রচুর তৃপ্তিবোধ করিতেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার গৃহের সান্ধ্য মজলিসের কথা স্মরণ-পথে উদিত হয়। বাড়ীর এই সান্ধ্য মজলিসে উপস্থিত গায়ক ও সাহিত্যিক প্রভৃতি গুণীদের লইয়া তিনি একত্র ভোজনে পরম তৃপ্তি লাভ করিতেন। প্রত্যেকের জন্য এখানে রাজসিক সম্বর্ধনার আয়োজন ছিল। সকলকেই শ্বেতপাথরের থালা, বাটি, ডিশ ও গেলাসে আড়ম্বর সহকারে অন্ন-ব্যঞ্জন, মাংস, মিষ্টি পরিবেশন করা হইত, দশজনকে লইয়া আহার করিতে তিনি এতই আনন্দ পাইতেন!

তারপর মজলিস ও আহারে অনেক রাত্রি হইয়া গেলে তিনি প্রত্যেককে নিজের গাড়ীতে করিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতেন! কাহাকেও কাহাকেও গাড়ী ভাড়া করিয়াও বাড়ী পাঠাইতেন।

চিত্তরঞ্জন বলিতেন, “দশজনের সঙ্গে ভোগ না করলে ভোগটা রোগ হয়ে দাঁড়ায়। সুরেশ সমাজপতি আমাকে বলেছে, আমি নাকি স্বর্ণ-গর্দভ! আরে স্বর্ণ-গর্দভ ত সোনা বয়, নিজে ভোগ করে না। আমি ত আকণ্ঠ ভোগ করছি, আমি কেমন ক'রে স্বর্ণ-গর্দভ হলাম?”

তাঁহার চরিত্রের এই যে জীবে প্রেম-ভাব, ইহার উৎস কোথায়? তাঁহার মনটি ছিল খাঁটি বৈষ্ণবের। "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা"—এই মনোভাবই তাঁহার সকলকর্মের প্রেরণা ছিল। তাঁহার বাড়ীতে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে একটি শ্বেতপাথরের বুদ্ধমূর্তি ছিল। উপরে উঠিবার সময় তিনি প্রত্যহ এই মূর্তির মাথায় হাত বুলাইয়া উহাকে চুম্বন করিতেন।

তিনি বৌদ্ধ ছিলেন, কিংবা খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন—এমন কথা বলাও শক্ত। তিনি বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত—একাধারে সবই ছিলেন। সকল মত ও পথের সারমর্ম তিনি হৃদয়ে বহন করিয়া চলিতেন। কীর্তন তাঁহার প্রিয় ছিল, কীর্তন ও নাম-সঙ্গীতে তিনি তন্ময় হইয়া থাকিতেন! বৈষ্ণব-কবিদের কবিতা, বিশেষতঃ চণ্ডীদাসের রচনা তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। নিজেও তিনি স্বরচিত কাব্যের মাধ্যমে বৈষ্ণবের গানই গাহিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একেবারে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব বনিয়াও যান নাই। বৈষ্ণবদের ন্যায় তিনি নিরামিষ-আহারও করিতেন না; কচি পাঁঠার মাংস তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিল। বেশভূষায়ও তিনি বৈষ্ণবদের অনুকরণ কখনও করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের জীবন-চরিত তাঁহাকে বিলক্ষণ প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

তিনি শুধু মৌখিক বিনয়ী ছিলেন না। বাস্তব জীবনেও তিনি যে কিরূপ বিনয়ী ছিলেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব:

আইন-ব্যবসায়ী হিসাবে তখন সারা দেশে তাঁহার অতুলনীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি। তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই কীর্তন হয়। এক রাত্রিতে তিনি একটি চেয়ারে আরামে বসিয়া কীর্তন শুনিতে-ছিলেন এবং সভাস্থলে সিগারেট সেবন করিতেছিলেন। তাঁহার

মুখ হইতে রাশীকৃত ধূম নির্গত হইতেছিল। কীর্তন-গায়ক চিত্তরঞ্জনের এইরূপ আচরণে স্বভাবতঃই যার-পর-নাই বিরক্ত হইয়াছিলেন।

গানের শেষে গায়ক বলিলেন, "শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির বাড়ীতে কীর্তন করলে মহাপ্রভুর অমর্যাদা হয়।" গায়ক পরে আর কোন দিন তাঁহার বাড়ীতে কীর্তন করিতে আসিবেন না, এইরূপ মত ব্যক্ত করিলে চিত্তরঞ্জন তাঁহার ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন। তিনি যেন আপনাকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। অমনি তিনি সবিনয়ে পরদিবস তাঁহাকে আসিতে বলিলেন।

শুধু তাই নয়, এই দিন তিনি তাঁহার সমস্ত ঘরে ফরাস পাতিলেন এবং নিজে একান্ত বিনয়নম্র চিত্তে পাপোশের উপর বসিয়া কীর্তন শুনিতে লাগিলেন। ভাবাবেশে তাঁহার চোখে জল আসিল।

বুদ্ধদেবের জীবন-ব্রত ছিল মানব-জাতির মুক্তির পথ নির্ণয় করা; জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর গ্রাস হইতে কেমন করিয়া মনুষ্যসমাজ রক্ষা পাইতে পারে, তাহারই পন্থা উদ্ভাবন করা, এবং এই পথ-আবিষ্কারের উদ্দেশ্যেই বুদ্ধদেব রাজার সুখ-ঐশ্বর্যে পদাঘাত করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। বুদ্ধের ছিল মানবের পারত্রিক কল্যাণ-কামনা; আর দেশবন্ধুর ছিল বত্রিশ কোটি ভারতবাসীর পার্থিব দাসত্ববন্ধন-মোচনের দুর্নিবার উন্মাদনা।

অপর দিকে, বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম, রামপ্রসাদ-চণ্ডীদাসের গীতিকাব্য, চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবে দয়া ও মানবপ্রেম চিত্তরঞ্জনের জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। শ্রীচৈতন্যের জীবন-চরিত তাঁহার

কাছে পরম প্রিয় ছিল। তিনি বলিতেন : “মহাপ্রভুর জীবনই একখানি কাব্য।”

॥ নয় ॥

পূর্বে বলিয়াছি, চিত্তরঞ্জনের জীবনে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রভাব অসাধারণরূপে বিস্তার লাভ করে। চিত্তরঞ্জনের কাব্যসাধনায় সেই প্রভাবই মূর্ত দেখা যায়। ভক্তি, বিনয়, জীবে প্রেম এবং বিষ্ণু-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ—ইহাই বৈষ্ণবধর্মের মর্মকথা। চিত্তরঞ্জন তাই প্রার্থনা করিতেছেন :

“নামিয়ে নাও জ্ঞানের বোঝা
সহিতে নারি বোঝার ভার।
(আমার) সকল অঙ্গ হাঁপিয়ে ওঠে
নয়নে হেরি অন্ধকার॥
সেই যে শিরে মোহনচূড়া,
সেই যে হাতে মোহনবাঁশী,
সেই মূরতি হেরব বলে
পরাণ বড় অভিলাষী !
বাঁকা হয়ে দাঁড়াও হে নাথ,
আলো করি কুঞ্জ-দুয়ার
এসো আমার পরশমানিক
বেদ-বেদান্তে কাজ কি আর॥”

তাঁহার লেখনী-নিঃসৃত কবিতা যেন শ্যামের হাতের বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে নির্গত সুমধুর ধ্বনির মত গগন-পবন মুখর করিয়া দেয়। সাগরের উদ্দেশে তিনি বলিতেছেন :

"আমার জীবন লয়ে কি খেলা খেলিলে,
আমার মনের আঁখি কেমনে খুলিলে!
আমার পরাণ ছিল কুঁড়ির মতন,
তোমার সঙ্গীতে তারে ফুটালে কেমন !
সকল জীবন যেন প্রস্ফুটিত ফুল,
বিচিত্র আলোকে গন্ধে করিছে আকুল।
সমস্ত জনম যেন আনন্দ-রাগিণী,
তব গীতে ওগো সিন্ধু, দিবস-যামিনী !" [সাগর-সঙ্গীত]

আপনার জীবনের প্রস্ফুটিত শতদল যেন তিনি বিষ্ণুর চরণে পুষ্প-নির্মাল্যের মত সমর্পণ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন:

"আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী! বাজাও আমারে
দিবস-রজনী ভরি আলোক-আঁধারে;
ওগো যন্ত্রী! আমি যন্ত্র বাজাও আমারে
তোমার অপূর্ব এই আলো-অন্ধকারে!" [সাগর-সঙ্গীত]

মানুষের বাস্তব জীবনে এই আত্মনিবেদনের মূল্য হয়ত অনেকেই দিতে কুণ্ঠিত। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ মানুষেরও একটা প্রেমার্ত মন আছে। সেই মন বিশ্বের সব কিছুকে আলিঙ্গন করিতে ব্যাকুল হয়, সকলকে প্রেমের ডোরে নিজেকে চায় বাঁধিতে। আপনার চারিদিকে মানুষ যখন কৃত্রিম প্রাচীর গড়িয়া তোলে শত বাধা আর নিষেধ দিয়া, তখন সেই প্রেমার্ত মন পিঞ্জরে আবদ্ধ কোকিলের মত মুক্ত গগনের আঙ্গিনায় বন্ধহীন পক্ষ বিস্তার করিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া বিচরণ করিতে চায়। এই যে অসীমকে আপন বাহুপাশে আলিঙ্গনে বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষা, উদ্ধৃত কবিতাটিতে তাহা আমরা স্পষ্ট বিকশিত দেখিতে পাই:

"হে আমার আশাতীত, হে কৌতুকময়ি !
দাঁড়ায় ক্ষণেক তোমা ছন্দে গেঁথে লই !
আজি শান্ত সিন্ধু ওই ম্লান চন্দ্রকরে
করিতেছে টলমল কি যে স্বপ্নভরে !
সত্যই এসেছ যদি হে রহস্যময়ি !
দাঁড়াও ক্ষণেক ! আমি ছন্দে গেঁথে লই !
দাঁড়াও ক্ষণেক ! আমি অর্ণবের গানে
পরিপূর্ণ শব্দহীন, অন্তরের তানে,
ছন্দাতীত ছন্দে আমি তোমারে গাঁথিব,
অন্তরে বিজনে আমি তোমারে বাঁধিব।
তুমি কি রবে না সেথা, হে স্বপ্ন-অঞ্চলা !
ছন্দোবদ্ধ, পরিপূর্ণ, নিত্য-অচঞ্চলা ?"

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্পর্কে একদিন সাহিত্য-মজলিসে তিনি বলিয়াছিলেন, "চণ্ডীদাসকে আমি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে করি। বিদ্যাপতিকেও আমি কবি হিসাবে ভক্তি করি, চণ্ডীদাসের কাছাকাছিই মনে করি—তবে তাঁর আলঙ্কারিকতার জন্য নয়। যে ভাব-মাধুর্য চণ্ডীদাসে প্রচুর, তা বিদ্যাপতিতেও কতকটা আছে বলেই। বিদ্যাপতির যদি আলঙ্কারিকতার এতটা লোভ না থাকত, তবে তিনিও হয়ত চণ্ডীদাসের সমকক্ষ হ'তে পারতেন।

"চণ্ডীদাস বাংলার নিজস্ব কবি। বাংলার মাটির অন্তরের খাঁটি রস পাবে চণ্ডীদাসে। মিথিলার কবি সংস্কৃত কবিদের শিষ্য। সংস্কৃত কবির প্রভাব তাঁর উপর অনেক বেশী। চণ্ডীদাসের মৌলিকতা বিদ্যাপতিতে নেই।"

কাব্যে কলাচাতুর্য ও রসমাধুর্য-প্রসঙ্গে দেশবন্ধু বলেন, "কলা-

চাতুর্যের জন্য রসমাধুর্যকে ক্ষুণ্ণ করা শ্রেষ্ঠ কবির লক্ষণ নয়। অলঙ্কারাদি দেহের ভূষণমাত্র। তার চেয়ে আত্মা, প্রাণ, এমন কি দেহলাবণ্যও ঢের বেশী দামী, ঢের বেশী যত্নের সামগ্রী। অলঙ্করণের দিকে বা কলাচাতুর্যের দিকে যারা খুব বেশী ঝোঁক দেয়, কবিতার ভাব ও রসের দিকে তাদের দৃষ্টি কম পড়ে। তুমি চণ্ডীদাস ও রাম-প্রসাদের কবিতায়ও অলঙ্কার যথেষ্ট পাবে, তবে তা নীরস শুষ্ক সোনা-জহরতের অলঙ্কার নয়, তাজা বনফুলের অলঙ্কার, ময়ূর-পাখার অলঙ্কার, গঙ্গা-মাটির তিলক-চিত্র ও চন্দন-কস্তুরীর অঙ্গরাগ।"

দেশবন্ধু রবীন্দ্রনাথের কবিতার অন্ধ-অনুরাগী ছিলেন না। তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে তৎসম্পর্কে অকপটে নিজের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। একদিন কবি কালিদাস রায়কে রবীন্দ্রকাব্য-প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথের যে সকল কবিতায় কৃত্রিমতা খুব বেশী এবং বিজাতীয় ভাবের প্রাধান্য, সে সকল কবিতা আমার ভাল লাগে না।"

"তোমরা মনে কর, আমি রবীন্দ্রনাথের কবিতার নিন্দাই করি। এ তোমাদের ভুল ধারণা। জান, আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় একটা সনেট লিখেছি। রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি কবিতা বেশ ভালো, সেগুলো টিকে যাবে।"

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের কবিতার তিনি উচ্চপ্রশংসা করিতেন। দেশবন্ধু বলিতেন, "দেবেন্দ্রনাথই রবীন্দ্র-যুগে স্বতন্ত্র ভাবধারা ও রচনাভঙ্গীর প্রবর্তক। সর্বপ্রকার কৃত্রিমতার বিরোধী এই কবি দেশব্যাপী দুঃখবাদের মধ্যে আনন্দ-বাদের প্রবর্তন করেছেন। তাঁর উদ্দাম ভাবোল্লাস সর্ববন্ধন ছেদন করে, সর্বভূষণ ত্যাগ করে প্রেমানন্দে যেন ধূলায় গড়াগড়ি দিয়েছে।"

দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের দেশপ্রেমোদ্দীপক গান ও কবিতা ভালবাসিতেন।

দেশবন্ধু নিজে কয়েকটি কীর্তনগানও রচনা করেন। তাঁহার রচিত কীর্তনগানে সুর যোজনা করিয়া, তাহা গাহিয়া শোনাইবার জন্য তিনি একজন গায়ক নিয়োগ করিয়াছিলেন। এইসব কীর্তন-গানে বৈষ্ণব-হৃদয়ের বিরহ ও মিলনের ভাব চমৎকাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটি গান এইরূপ ঃ

"মিটায়ো না এই পিয়াসা
এই ত আমার মিষ্টি লাগে !
ওগো বিরহী, চিরবিরহী,
এই তৃষা যেন নিত্য জাগে !!
মিলন আমি চাই না হে,
এই পিয়াসা যেন নিত্য থাকে !
চোখের জল এত মধু
প্রাণবঁধু হে, প্রাণবঁধু !
মুছায়ো না চোখের বারি
নাই বা এলে আঁখির আগে।
নাই বা যদি মিলন হল,
এই বিরহ যেন নিত্য জাগে !"

এই গানটি দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন এই দেশের দিক্-দিগন্তে বিস্তৃত, সেই সময় কবি দেবেন্দ্রনাথ সেনের উদয়। দেবেন্দ্রনাথের ছন্দ, রচনা-ভঙ্গী সবই ছিল স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত। চিত্তরঞ্জন দেবেন্দ্রনাথের অনুরাগী ছিলেন। তিনি তঁহোর 'মালঞ্চ'-কাব্যগ্রন্থে

দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে একটি সনেট উপহার দেন। সনেটটির শেষ কয়েকটি পংক্তি এইরূপ ঃ

"তোমার কবিতা আমি বড় ভালবাসি
সুখ-ভরা, শান্তি-ভরা, স্বপ্ন-ভরা সবি,
ব্যঙ্গ-ভরা বাক্য আর রঙ্গ-ভরা হাসি!
তব যোগ্য নহে তবু পাঠাইনু ভেট্
আমার আগ্রহ-ভরা ভিখারী সনেট।"

দেশবন্ধু-বিরচিত 'প্রেম ও প্রদীপ' নামক কবিতায় অন্তরের দেবতার উদ্দেশে তাঁহার আকুতি পরিস্ফুট দেখা যায় ঃ

(১)

"আজি এ সন্ধ্যার মাঝে তব বাতায়নে
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?
তোমার ও প্রদীপের কনক-কিরণে
আমার সকল মন উঠে উজলিয়া!
কেন রাখিয়াছ আহা! সুখ-বাতায়নে
সোহাগে স্বহস্তে ওই প্রদীপ জ্বালিয়া?
আপনারে কেহ কভু পারে কি রাখিতে
আলোকের অন্তরালে গোপন করিয়া?
তোমার লাবণ্য-মূর্তি পড়ে না আঁখিতে,
ছায়া তার পড়িয়াছে দেয়াল ভরিয়া!
অসংখ্য আকাঙ্ক্ষা জাগে দেখিতে দেখিতে,
কেন রাখিয়াছ ওগো! প্রদীপ জ্বালিয়া?

(২)

অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝারে
কেন গো জ্বালিলে দীপ, খুলিলে দুয়ার—
কেন গো এমন ক'রে ডাকিছ আমারে
সমস্ত পরাণ ভ'রে—পরাণ মাঝারে !
আমি অশ্রুজল লয়ে শুধু চেয়ে থাকি
আমি ত জ্বালিনি দীপ—কি করিয়া ডাকি ?

(৩)

তবু মনে হয়, তুমি শুনেছ আমার
অন্তরের আর্তস্বর—অন্তর মাঝারে !
নিবাও প্রদীপ তব, বন্ধ কর দ্বার,
এস ভেসে স্বপ্নসম অন্তর-আঁধারে।
জ্বলে গো প্রদীপ জ্বলে অন্তরে আমার,
অন্ধকার-ঘেরা এই সন্ধ্যার মাঝার !

(৪)

তোমার চঞ্চল দীপ আলোক-বন্ধন ;
জ্বলিছে সকল মন, সর্বাঙ্গ আমার।
কত না অশান্ত সুখ অজানা ক্রন্দন
ঝাপটিছে গরজিছে অন্তরে আমার !
হে মোর নিষ্ঠুরা ! কি যে বেদনা-বন্ধনে
টানিতেছে সর্বহৃদি তব সন্নিধানে !
কি ব্যাকুল বাসনার আকুল ক্রন্দনে
ভরিয়া গিয়াছে চিত্ত তোমারি সন্ধানে।
প্রজ্বলিত হৃদি-মাঝে শূন্য সব ঠাঁই।
হে প্রেম-নিষ্ঠুরা ! আমি যে তোমারে চাই।"

[প্রেম ও প্রদীপ]

"মোছ আঁখি, মনে কর এ বিশ্ব-সংসার
কাঁদিবার নহে শুধু বিশাল প্রাঙ্গণ,
রাবণের চিতাসম যদিও আমার
জ্বলিছে জলুক প্রাণ, কেন গো ক্রন্দন ?
অপরের দুঃখ-জ্বালা হবে মিটাইতে,
হাসি-আবরণ টানি, দুঃখ ভুলে যাও ;
জীবনের সরবস্ব অশ্রু মুছাইতে,
বাসনার স্তর ভাঙ্গি' বিশ্বে ঢেলে দাও।
হায় হায় জনমিয়া যদি না ফুটালে
একটি কুসুম-কলি—নয়ন-কিরণে
একটি জীবন-ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুক-ভরা প্রেম ঢেলে—বিফল জীবনে।
আপনা রাখিলে, ব্যর্থ জীবন সাধনা,
জনম বিশ্বের তরে—পরার্থে কামনা।
[মালা]

বাংলা ১৩২১ সালে দেশবন্ধু নিজ সম্পাদনায় 'নারায়ণ' মাসিক-পত্র প্রকাশ করেন। জলধর সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ ইহার প্রথম সংখ্যায় প্রবন্ধাদি লেখেন।

দেশবন্ধু বাংলা ভাষার উন্নতি-বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহী ছিলেন। তিনি বলিতেন ঃ "বাংলার সম্পদ বাংলা ভাষা। কেমন ক'রে কথার বিবর্তন হ'লো, অন্য ভাষা থেকে কি কি শব্দ বাংলা ভাষায় ঢুকল, অন্যান্য ভাষায় এর ব্যবহার কিরূপ ছিল, কোন্ লেখক কোন শব্দ কি অর্থে ব্যবহার করেন, তার একটি বই থাকা আবশ্যক।"

বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপান্তর তিনি চাহিয়াছিলেন বাংলা দেশের মাটির রসের সঙ্গে পূর্ণ যোগ রাখিয়া। এখানে বিচ্ছেদ তাঁহার সহ্য হইত না। তিনি বলিতেন : "বাংলার ভক্তকবি চণ্ডীদাস-রামপ্রসাদের বাংলার স্বধর্মপরায়ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর অমৃতোপম রসানুভূতিতে যেই রসসৃষ্টি হইয়াছে, সেই সাধনার নামে সেই অনুপম কাব্যসৃষ্টির পথে নিজেদের ও দেশের গতিকে লইয়া যাও, নিজের জীবনে ও কর্মে মিলাও, তোমার নিজেরও পরিচয় হইবে, দেশেরও পরিচয় হইবে, ফেরঙ্গ-জীবন ও সাহিত্যের এই মহাভীতি হইতে তবেই রক্ষা পাইবে।"

চিত্তরঞ্জনের দেশাত্মবোধ ও ধর্মবোধ তাঁহার কাব্য ও সাহিত্য-সাধনায় এক ও অভিন্নরূপে মিশিয়া আছে। তিনি ধর্ম ও দেশানুরাগকে বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ করেন নাই। আর তাঁহার এই প্রেরণার মূলমন্ত্র হইতেছে মিলন ও প্রেম। সকলকে ভালবাস, চোখের জলে দুঃখীর দুঃখ মোচন কর, কাহাকেও ঘৃণা করিও না, কাহাকেও দূরে ঠেলিও না, ইহাই ছিল তাঁহার মর্মবাণী।

॥ দশ ॥

১৯২৫ সালের ১লা জানুয়ারি দেশবন্ধু পিত্তশূল-বেদনায় আক্রান্ত হন। সঙ্গে জ্বরাতিসার। ৭ই জানুয়ারি আইন-সভায় অর্ডিন্যান্স বিল উত্থাপন হইবে। এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে বিনা বিচারে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বাংলার তরুণদিগকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারারুদ্ধ রাখা চলিবে। রোগের যন্ত্রণায় তিনি কাতর। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অসহ্য যন্ত্রণা, চোখে ঘুম নাই। ৭ই জানুয়ারি প্রাতে তিনি স্থির করিলেন, শরীর যতই দুর্বল থাকুক, এই বিল প্রতিরোধ করিতেই হইবে। আইন-সভায় তাঁহাকে যাইতেই হইবে। অথচ, তিনি এখন এমন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহার কথা বলিবার শক্তিও নাই।

কিন্তু বাংলা দেশের প্রতিনিধি বলিয়া বৃটিশরাজ্যের নিকট সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত কতকগুলি খয়েরখাঁ ভোটের জোরে বাংলার তরুণ দেশপ্রেমিকদিগকে লোকচক্ষুর অন্তরালে লইয়া যাইয়া আটক রাখিবার উদ্দেশ্যে কালো-আইন পাস করাইয়া লইবে—এই চিন্তা তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল।

তিনি বলিলেন, "আজ আইন-সভায় 'ব্ল্যাক বিল' উঠবে, আমাকে যেতেই হবে"

তিনি কাহারও নিষেধে কর্ণপাত করিলেন না। ডাক্তারগণও নিরুপায় হইয়া একান্ত অনিচ্ছায় তাঁহাকে সম্মতিদান করিলেন। তিনি স্ট্রেচারে করিয়া কাউন্সিলে গেলেন। তাঁহারই চেষ্টায় এই 'ব্ল্যাক বিল' বাতিল হইয়া যায়।

দেশের ইষ্ট-সাধনার কাছে তিনি নিজের সকল আরাম এমন-

ভাবেই তুচ্ছজ্ঞান করিতেন, দেশের হিত-সাধনায় নিজেকে এমনি করিয়া বিলাইয়া দিতেন।

শরীর তাঁহার একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য পাটনায় গেলেন। এই সময় তাঁহার শরীর বড়ই দুর্বল হইয়া পড়ে। তিনি তিনমাস অনিদ্রায় কষ্ট পান। বাত, বাতজনিত অনিদ্রা এবং বহুমূত্র রোগ তাঁহাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। তিনি এই সময় প্রায়ই বলিতেন: "আমার আরও কিছুদিন বাঁচা দরকার মনে করি। কিন্তু, বেশী দিন আমি বাঁচব না।"

কখনও কখনও তিনি দেশের চিন্তায় কাঁদিয়া ফেলিতেন।

পাটনায় তিনি তিনমাস অবস্থান করেন। এই সময় এক দিন তিনি সারারাত্রি রক্ত-বমি ও রক্ত-দাস্ত করেন। প্রাতে কিছুটা সুস্থ হইলেন বটে, কিন্তু শরীরে একবিন্দু শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। তিনি এলোপ্যাথি ঔষধ-সেবনে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু মনের বল তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। ডাক্তার একবার তাঁহাকে এই দুর্বল অবস্থায় ব্র্যাণ্ডি খাইতে উপদেশ দিলে তিনি বলিলেন, "আর এ জীবনে নয়। একবার ছেড়েছি, আর তা ছোঁব না।"

শরীর অবসন্ন। কেবল চিকিৎসায় সারিবার নয়। ডাক্তারা বলিলেন, সমুদ্রভ্রমণে উপকার হইবে। তাঁহারও তাহাই ইচ্ছা। কিন্তু এদিকে দেশের কাজ, অপর দিকে অর্থের অভাব। সমুদ্র যাত্রার পথে এই দুই বাধাই এখন দুরতিক্রম্য। এতদিন অর্থপ্রার্থীদের ভীড় যাঁহার দরজায় বিস্ময় সৃষ্টি করিত, আজ তিনি নিজেই অর্থ-সাহায্যপ্রার্থী। কিন্তু সাহায্য জুটিল না। সমুদ্রযাত্রাও তাই সম্ভব হইল না!

তিনি বলিতেন, "আইন ব্যবসায় না ছাড়লে দেশের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করতে পারতাম না।"

বন্ধুদের নিকট বলিতেন, "তোমরা কি মনে কর, অর্থের অভাবে আমার কষ্ট হচ্ছে? না, তা নয়। এজন্য আমি দুঃখিতও নই। দুঃখ শুধু আমার অভাবগ্রস্ত লোকেদের জন্য। তাদের টাকা না দিতে পারলে আমার বড় দুঃখ হয়।"

১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। ২রা মে তাঁহার সভাপতিত্বে ফরিদপুরে রাজনৈতিক সম্মেলন হইবে। গান্ধীজীও ইহাতে যোগদান করিবেন।

ফরিদপুর-সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে দেশবন্ধু স্বরাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, "জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশলাভের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসই খাঁটি স্বরাজ-সাধনা। আমি সেই পূর্ণস্বরাজ-লাভেরই জন্য ব্যাকুল হইয়া আছি।"

ভারতে জাতীয় একতা সম্পর্কে এই ভাষণে চিত্তরঞ্জন কয়েকটি মূল্যবান উক্তি করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "ভারতে জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য দেশের চেয়ে এখানে যথেষ্ট একতা আবশ্যক। কারণ, ভারতের মতন এত বৈচিত্র্য পৃথিবীর অল্প দেশেই আছে। তাই এখানে অল্প একতাতেই জাতীয়তা-প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। দৃঢ় একতা-সংস্থাপন কঠিন কাজ হইলেও তাহা করিতেই হইবে।"

ফরিদপুর-সম্মেলনের পরে দেশবন্ধুর স্বাস্থ্যের চরম অবনতি ঘটিল। তিনি বায়ু-পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিং যাইবেন, স্থির করিলেন।

১৯২৫ সালের মে মাসে তিনি দার্জিলিং রওনা হইলেন।

॥ এগার ॥

দার্জিলিংয়ে পৌঁছিয়া তিনি 'স্টেপ্ এসাইড' নামক বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন। এখানে পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে তিনি ভালবাসিতেন। সঙ্গে রিক্সা থাকিতেও তিনি পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতেন। ক্লান্তিবোধ হইলে রিক্সায় উঠিতেন।

ক্রমে তাঁহার আহারে রুচি বাড়িতে লাগিল।

এই সময় মহাত্মাজী বাংলা-সফরে আসিলেন। দেশবন্ধু তাঁহাকে দার্জিলিংয়ে আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাকে দার্জিলিংয়ে পাইয়া দেশবন্ধু আনন্দে অধীর হইলেন।

রোগশয্যাশায়ী হইয়াও দেশবন্ধু তাঁহার পল্লী-সংগঠনের স্বপ্ন পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তিনি গান্ধীজীকে বলিলেন, "এখন আমার প্রধান ভাবনা হচ্ছে পল্লী-সংগঠন। চরকা ও পল্লী-সংস্কার, এই হচ্ছে প্রধান কাজ।"

দার্জিলিংয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে রাজনীতি-আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে রঙ্গ-রসিকতাও চলিত। গান্ধীজী ছাগলের দুধ পান করিতেন। তাঁহার জন্য পাঁচটি ছাগল আনা হইয়াছিল। দেশবন্ধু একদিন তাঁহার এক সহকর্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছাগলগুলো ঠিক্ ঠিক্ দুধ দিচ্ছে ত?"

সহকর্মী উত্তরে বলিলেন, "পাঁচটার মধ্যে দু'টো দিচ্ছে, তিনটে শুয়ে পড়েছে।"

গান্ধীজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এদের আত্মসম্মানবোধ দেখে আমি খুশী হয়েছি।"

দেশবন্ধু বলিলেন, "ছাগলেরা অসহযোগ করেছে। যে দু'টি সহযোগিতা করেছে, তাদের খেতাব দিয়ে দাও, আর অসহযোগীদের জেলে আটকের ব্যবস্থা কর।"

দার্জিলিংয়ে একান্তে দুই মহাপ্রাণ নেতার নিবিড় আলাপ জমিয়া উঠিত। একদিন গান্ধীজী দেশবন্ধুকে বলিলেন, "আপনি জেল থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন, 'গঙ্গাতীরে আশ্রম করে থাকবেন।' আর আমিও আপনার সঙ্গে থাকব বলেছিলাম। আজ আপনার আশ্রমবাসের অবস্থাই হ'লো।"

কিছুকাল দার্জিলিংয়ে অর্ধ-সুস্থ অবস্থায় যাপনের পর দেশবন্ধু জুন মাসের মাঝামাঝি বেশী অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। প্রবল জ্বর হইতে লাগিল। সেই সঙ্গে সর্বাঙ্গে ব্যথা। ১৬ই জুন সকালে তাঁহাকে অক্সিজেন দেওয়া হইল।

তাঁহার জীবনীশক্তি ক্রমেই যেন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া পড়িতে লাগিল। অপরিসীম অবসন্নতার ভারে তিনি ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন।

ডাক্তাররা আশা ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল।

১৬ই জুন বিকাল পাঁচটায় বাংলার দীনদুঃখীর আপনজন দেশবন্ধু দার্জিলিং-এর শৈলশিখরে অস্ত গেলেন।

মৃত্যুর খবর চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবামাত্র দার্জিলিং-এর ভুটিয়া পাহাড়ী নারীরা পর্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। 'স্টেপ এসাইড' লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল।

সমগ্র ভারতবর্ষ শোকের দুঃসহ আঘাতে স্তব্ধ—বিহ্বল—মুহ্যমান। দেশবন্ধু নাই!

১৭ই জুন তাঁহার শব কলিকাতা পৌঁছিল। বিশাল জনতা তাহাদের প্রাণপ্রিয় দেশবন্ধুর প্রতি অন্তরের শেষ প্রীতি ও শ্রদ্ধা-নিবেদনের জন্য নিষ্প্রাণ দেহের চারিদিকে সমবেত হইল। তাঁহার মরদেহ লইয়া নিদারুণ শোকে স্তব্ধ জনসমুদ্রের শোকযাত্রা এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করিল। কেওড়াতলার মহাশ্মশানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

চিতাবহ্নি নির্বাপিত হইল, কিন্তু দেশবন্ধুর দেশবাসীর শোকাগ্নি নিভিল না, তাহাদের অশ্রু শুষ্ক হইল না।

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণে কবিগুরু অনুপম ভাষায় লিখিলেন:

"এনেছিলে সাথে ক'রে
মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি
ক'রে গেলে দান।"

॥ বার ॥

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁহার সংগ্রামময় জীবনে বহু রাজনৈতিক ভাষণে ও তাঁহার রচিত কবিতাবলীতে অনেক সারগর্ভ কথা আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। সব কথাই এখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। নিম্নে আমরা তাঁহার কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিলাম :

> "মুক্তিপিপাসু কোন জাতিকেই নির্যাতন বা পীড়নের সাহায্যে এই পৃথিবী হইতে লুপ্ত করা যায় না। স্বাধীনতাকামী কোন জাতিকে প্রতিরোধ করিতে পারে, এমন ক্ষমতা কাহারও নাই। স্বাধীনতার জন্য জীবন বলি দিতে হইলে আমি তাহার জন্য প্রস্তুত আছি।"

*　　*　　*　　*

> "বাংলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাংলার ইতিহাসের ধারা কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল, মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে জাগিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এদেশে আসিল, বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম কি। বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্তি সেই—
>
> 'তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম,
> তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
> ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে ॥’—

সেই মাকে চিনিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের ‘কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল’। বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি, সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, খ্রীষ্টান হউক, বাঙালী বাঙালী। বাঙালীর একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙালীকে প্রকৃত বাঙালী হইতে হইবে। বিশ্ব-বিধাতার যে অনন্ত সৃষ্টি, বাঙালী সেই সৃষ্টি-স্রোতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপ-বৈচিত্র্যে বাঙালীর একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার বাংলা—সেই রূপের মূর্তি। আমার বাংলা সেই বিশিষ্ট রূপের প্রাণ। যখন জানিলাম, মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর, আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।”

* * * *

“ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের কথা মুখস্থ করিয়া সেইগুলিকে রসান দিয়া বাংলায় বলিলেই বাঙালীর জীবন হঠাৎ বিচিত্র হইয়া উঠে না। এই মিথ্যা বৈচিত্র্য পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত-জনিত খণ্ডের বিচ্ছিন্নতা ও বিভিন্নতা মাত্র। আমি যে প্রাণ ও সাধনার দিকে

ফিরিতে বলিতেছি, বাংলা তাহার নিজের মাধুরী আস্বাদন করিয়া নিজে যে বিচিত্ররূপে জগতের কাছে নিজেকে ধরিয়াছিল ও আপনি যে শত শত অপূর্ণভাবে বিচিত্র হইয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সেই বিচিত্র প্রাণের ধারারই কথা। পাশ্চাত্যের এই ভাবমোহ, এই 'বিশ্বমোহ' যাহা আমাদের সমস্ত স্নায়ুকে নাড়ীচক্রকে ব্যাধি-পীড়িত মূর্ছারোগগ্রস্ত করিয়াছে. তাহা হইতে আমাদের উদ্ধার পাইতেই হইবে।"

* * * *

"ভারতের স্বাধীনতা কিরূপে আসিবে? শহরে বসিয়া বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলে স্বাধীনতা আসিবে না। জাতির যাহারা মেরুদণ্ড, সেই পল্লীগ্রামে যাইয়া পল্লীবাসীর প্রাণে স্বাধীনতার ভাব ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য আকুল না হইলে কখনও স্বাধীনতালাভ হইবে না। পল্লীতে পল্লীতে সাধারণ পাঠাগার, নৈশবিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া পল্লীর জনমতকে স্বাধীনতার অনুকূল করিয়া গঠন করিতে হইবে।"

* * * *

"খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সতের জন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বক্তিয়ার খিলজী বাংলা দেশ জয় করিয়াছিলেন, আমি সেটাকে বড় সাংঘাতিক মনে করি না, পলাশীর আম্রকাননে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইব দুই-চারিটি আতসবাজী ফুটাইয়া বাংলা দখল করিয়াছিলেন, আমি তাহাও বিশেষ গুরুতর মনে করি না, কিন্তু ভারতের যে Cultural Conquest হইতেছে, আমি তাহারই পরিণাম ভাবিয়া আকুল হইতেছি। এই Cultural Conquest-এর হাত হইতে অব্যাহতি না পাইলে বাঙ্গালী—তথা ভারতবাসীর মুক্তির কোন আশা নাই।"

* * * *

"কাহারও কাহারও মতে ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি পৃথক পৃথক জিনিস—একের সহিত অন্যের কোনই সম্পর্ক নাই, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইহারা বিশেষভাবে সম্পর্কিত, একটাকে অন্যটা হইতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক্ করা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে ইহাদিগকে ভিন্নরকম বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। আসলে কিন্তু ইহারা এক। একটা অন্যটার উপর নির্ভর করে। ক্রীতদাসের কি সমাজ কিংবা ধর্ম আছে? নিশ্চয় না। যাহারা স্বাধীন, তাহাদিগেরই মাত্র ধর্ম বা সমাজ আছে। আপনারা যদি আপনাদের ধর্ম কিংবা সমাজকে রক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে আপনাদিগকে স্বাধীন হইতে হইবে। কাজেই আপনি যদি ধার্মিক হইতে কিংবা সমাজের উপকার করিতেই ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আপনি রাজনীতি বাদ দিতে পারেন না। তাই বলিতেছি, ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি পরস্পর নির্ভরশীল। কোন্‌টা যে আগে ও কোন্‌টা পশ্চাতে, তাহা বলা দুরূহ। দিনরাত্রির পূর্বাপর ঠিক করা যে প্রকার দুষ্কর, ইহাও ঠিক সেই-প্রকার। অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে, স্বাধীনতা অর্জন করিব কি প্রকারে? উত্তরে আমি এই মাত্র বলিতে পারি, দেশবাসীর সম্মুখে যে কর্তব্যকর্ম পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা নিষ্পাদন করিতে হইবে। আপনারা ক্রীতদাস না হইয়া মানুষ হউন। দেশের প্রতি আপনাদের যে কর্তব্য আছে, তাহা সম্পাদন করুন। স্মরণ রাখিবেন, স্বাধীনতা-অর্জন ও দেশের উন্নতির যাহারা পরিপন্থী হইবে, সর্বত্র তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।"

॥ শেষ ॥